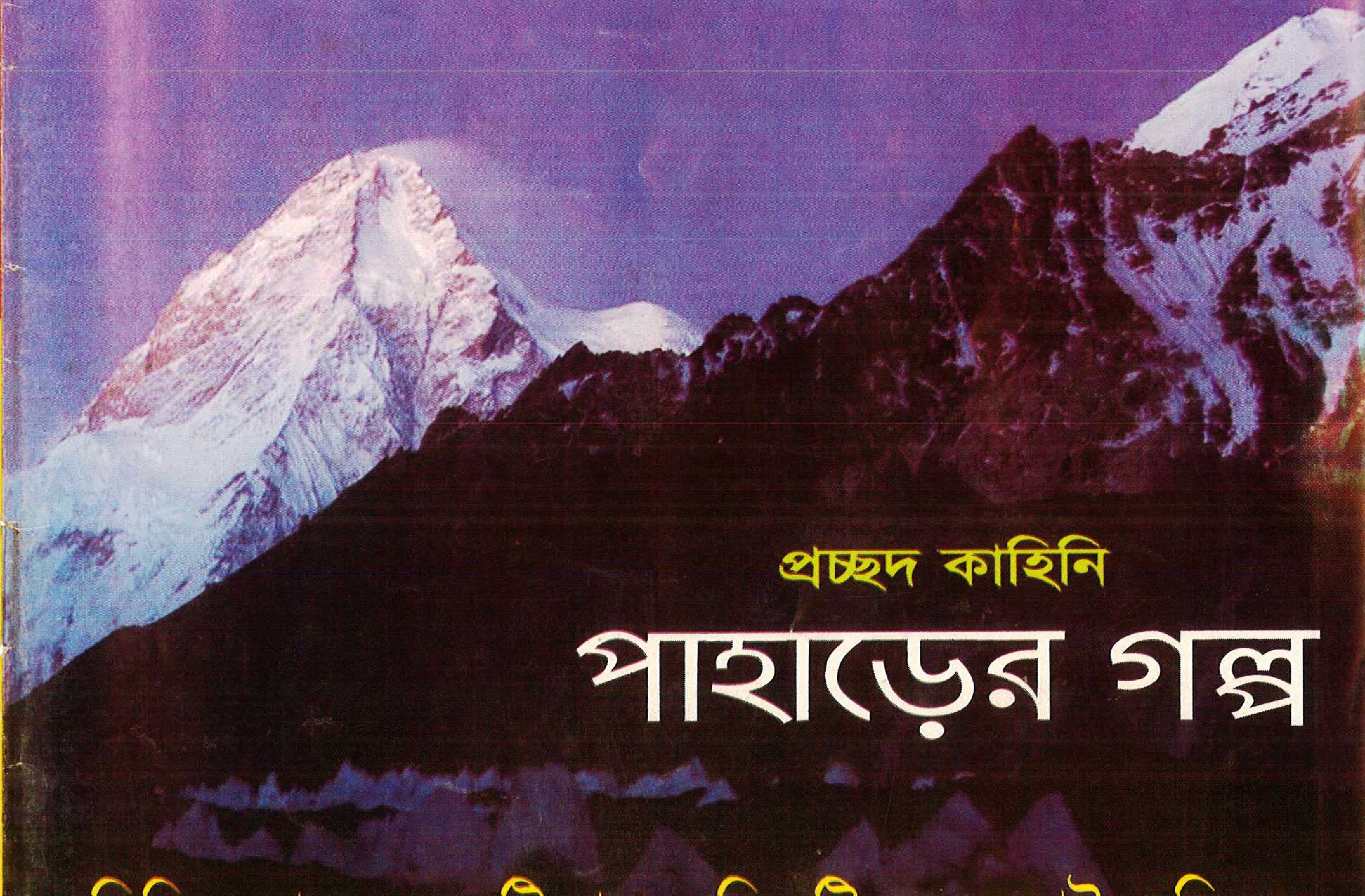
ছোটোদের মাসিক পত্রিকা

Vol - 2 ● Issue - 6 ● CHIROKALER CHHELEBELA ● December 2012 ● DL No. 48 ● Dated - 7.3.2011 ● Title Code WBBEN14163

চিরকালের ছেলেবেলা

১০ টাকা

ডিসেম্বর ২০১২



প্রচ্ছদ কাহিনি

পাহাড়ের গল্প

বিচিত্র স্বাদের ছয়টি গল্প • তিনটি জমজমাট কমিকস

ছোটোদের অনুষ্ঠানের আগাম খবর



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ বিজয় বাসফরে

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জানুয়ারি সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে

প্রবীণ সাংবাদিক – যশস্বী লেখক

ফেলু মামা সিরিজের স্রষ্টা, অজস্র জীবনবাদী গ্রন্থের রচয়িতা

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

ধারাবাহিক রোমাঞ্চকর কিশোর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

নৃতত্ত্বে আগ্রহী কলকাতার এক সাংবাদিক কৌশিক রায় কম্বডিয়ার নম্পেন শহরে গিয়েছিলেন এশিয়ান সম্মেলন কভার করতে। ফেরার পথে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে দুদিনের জন্য নেমেছিলেন ছুটি কাটাতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে অদৃষ্টের পরিহাসে অষ্ট্রেলিয়ার এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে চলে গেলেন এক নির্জন দ্বীপে। এক বিলুপ্ত নরখাদক প্রজাতি হব্বিটস -এর সন্ধানে। তারপর নিজেই নরখাদকদের খাদ্যে পরিণত হতে হতে কীভাবে বেঁচে ফিরলেন তারই রোমহর্ষক বিবরণ–

নরখাদকেরা এখনও আছে

জুরান নাথের 'বাবলু আর গাবলু'

বারিদ বরণ চৌধুরীর 'হ্যাবলাদা' ও 'যমজভাই' ছাড়াও আসছে

ছড়ায় গড়া নতুন কমিকস

টুসি-টমি

এছাড়াও একগুচ্ছ গল্প, ছড়া-কবিতা ও অনন্যা বিভাগ তো থাকছেই।

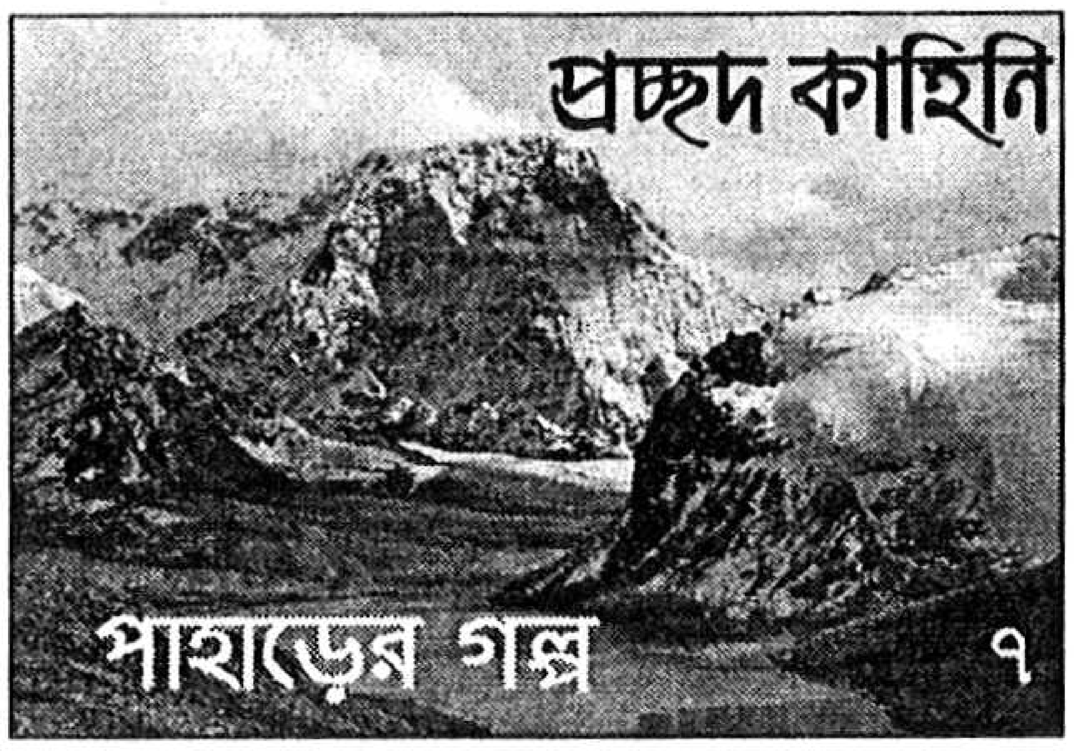


সন্তু আর জোজোর মতো আমরাও হারালাম কাকাবাবুকে

বছর বছর কাকাবাবু আর অ্যাডভেঞ্চারে বেরবেন না। সন্তু আর জোজোর মতো আমরাও ছিলাম কাকাবাবুর প্রত্যেকটি অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী। অষ্টমীর রাতে অ্যাডভেঞ্চারের মহানায়ক কাকাবাবুর মহাপ্রস্থানের কাহিনি আমাদের আর জানা হবে না। তাঁর রেখে যাওয়া অমূল্য সৃজনগুলি থাকবে আমাদের হৃদয় জুড়ে আজীবনকাল। কান্নাভেজা চোখে আমরা তাঁর চিরশান্তির কামনা করি।

একটি পাহাড়, মনটি তাহার
কঠিন হতো যদি–
এমনি করে বুক বেয়ে কি
নামিয়ে দিতো নদী !

পাহাড়ের সব বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প বললেন সমীরণ মুখোপাধ্যায়



নিয়মিত বিভাগ

রামায়ণ কথা



পিতৃসত্ব পালনে রামচন্দ্র চোদ্দ বছরের বনবাস জীবন শুরু করলেন চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে। এবারের রামায়ণ কথায় তারই বর্ণনা দিলেন **দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**।-৩৮

ছোটোদের নিজস্ব বিভাগ

মজায়-মজায় জমজমাট তিনটি কমিকস্

জুরান নাথের



বারিদ বরণ চৌধুরীর





বিচিত্র স্বাদের ৬টি গল্প





ছড়া-কবিতা

যাঁদের লেখা পড়ে আনন্দ পেয়েছি

আমি স্বাগতা। ছড়া ও গল্প লিখি। লিখতে চেষ্টা করি। 'চিরকালের ছেলেবেলা' শারদীয়া ১৪১৯ আমি অনেক আগেই পড়ে ফেলেছি। চিঠি লিখব লিখব করে লেখা হয়নি। আজ নবমীর দিন লিখতে যাচ্ছি আর অমনি টিভিতে শুনলাম, শ্রদ্ধেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মনটা বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল। ছোটোদের নিয়ে যেখানেই তাঁর লেখা পাই আমি পড়ি। আমার সৌভাগ্য যে তিনি আকাডেমির 'চির সবুজ লেখা'র সম্পাদক থাকাকালীন আমার বেশ কয়েকটি লেখা তাঁর পত্রিকায় বের হয়েছে। তিনি আমার কাছে অমর হয়েই থাকবেন।

এবার বলি 'চিরকালের ছেলেবেলা'র কথা। পত্রিকাটা পেয়েই বাড়ির সবাই কাড়াকাড়ি করতে লেগেছিলাম। প্রচ্ছদ ভীষণ ভালো। প্রত্যেকটি লেখা এতো ভালো যে আমি দু'দিনের মধ্যেই শেষ করে দিয়েছি। যাঁদের লেখা পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি তাঁরা হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল জানা, বলরাম বসাক, প্রচেত গুপ্ত, কার্তিক ঘোষ, রতনতনু ঘাটী, পবিত্র সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ, অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায়, চন্দন নাথ, অবি সরকার, সরল দে, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রিখিয়া ভুক্ত। কমিকস্‌গুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে।

'কিচির মিচির' বিভাগে আমার লেখা দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি।

স্বাগতা রানু (মেটেলা, বীরভূম)



নিয়মিত পড়ি

আমার বড্ড প্রিয় একটি পত্রিকা 'চিরকালের ছেলেবেলা'। আমি নিয়মিত পড়ি। আমার স্কুল শ্যামবাজারে। মোড় থেকেই কিনি। ছোটোবেলায় ফিরে যাই। বৈচিত্র্য ও বিষয় ভাবনা ভালো। শিশু সাহিত্য বড্ড কঠিন জিনিস। ভাববার বিষয়। অবকাশ এবং সু-চিন্তনের আজ বড্ড অভাব। আপনাদের প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

জিতেন মিস্ত্রী মোহনলাল স্ট্রিট, কলকাতা

দারুণ সব গল্প ছড়া

শারদীয়া 'চিরকালের ছেলেবেলা' পড়লাম। মুগ্ধ হলাম। যেমন প্রচ্ছদ, তেমনি অলংকরণ, দারুণ সব গল্প ছড়া। মনটা ভরে গেল। সুসম্পাদিত এই পত্রিকাটির প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমাকে অবাক করছে।

সুজিতকুমার পাত্র আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সেপটিপিন আর দেশলাই কাঠি

কিছুদিন আগে আমি 'চিরকালের ছেলেবেলা' ছোটোদের মাসিক পত্রিকাটি দেখতে পাই বইয়ের দোকানে। সেদিন কিনে বাড়িতে বসে পত্রিকাটি পড়লাম। খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে 'এসো ম্যাজিক শিখি' বিভাগের সেপটিপিন আর দেশলাই কাঠির ম্যাজিকটা। ধাঁ-ধাগুলোও খুব ভালো। আমি চাই পত্রিকাটি যেন কোনোদিন বন্ধ করে না দেওয়া হয়।

সায়ন্তনী আচার্য্য বাগুইহাটি, উঃ ২৪ পরগনা

ছেলেবেলার ম্যাজিক

আপনার স্বচ্ছ সুসম্পাদিত প্রথম সারির শিশু-কিশোর সাহিত্য পত্রিকা 'চিরকালের ছেলেবেলা' পড়ে মুগ্ধ হলাম। পড়তে পড়তে হারিয়ে গেলাম ছেলেবেলার ফেলে আসা দিনগুলোতে। সত্যি! এটাই তো ছেলেবেলার ম্যাজিক। 'চিরকালের ছেলেবেলা'কে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় মাশিয়াড়া, বাঁকুড়া

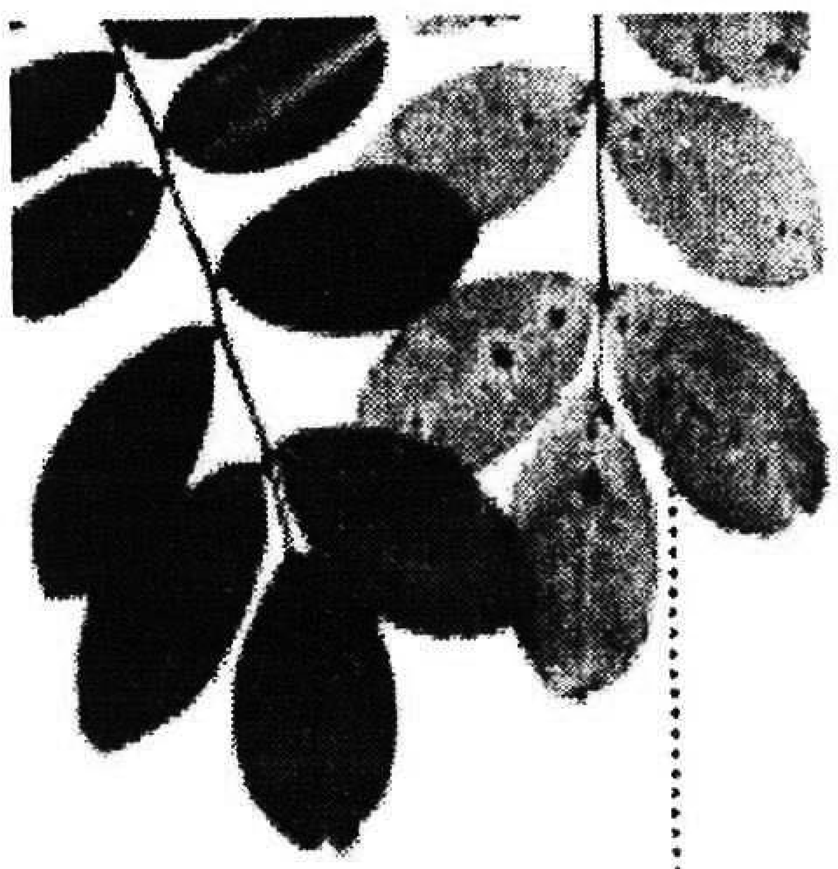
মনে পড়ে যাচ্ছে

'চিরকালের ছেলেবেলা' আগস্ট সংখ্যা, ২০১২ হাতে পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। সত্যি পত্রিকাটি শিশু-কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী। গল্পের মান আনন্দ-দায়ক। মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলেবেলার কথা পত্রিকাটি পড়তে পড়তে।

কেষ্ট মণ্ডল বাঁশবেড়িয়া, হুগলি

চিঠি ও লেখা-আঁকা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক : চিরকালের ছেলেবেলা
'প্রাণ বাগিচা', সোদপুর রবীন্দ্র নগর, ডাক্তার বাগান, কলকাতা – ৭০০ ০৮২



বছর ঘুরলেও ফিরে পাবো না

দেখতে দেখতে দুর্গা পুজো শেষ। একে একে লক্ষ্মী পুজো, ঈদ, কালী পুজো, ভাই ফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পুজো, মহরম চলে গেল। চলে গেলেন কাকাবাবুও। এখন শুধু শূন্যতা। মন খারাপের পালা...

চলে যাওয়া সবকিছুকেই বছর ঘুরলে ফিরে পাবো আমরা, পাবো না শুধু কাকাবাবুকে। তাঁর রেখে যাওয়া অনবদ্য সৃষ্টিই অমর করে রাখবে তাঁকে আমাদের মধ্যে।

বার্ষিক পরীক্ষা কারো কারো শুরু হয়ে গেছে। খুব ভালো করে পরীক্ষা দিও কিন্তু। নতুন ক্লাসে উঠে মনের আনন্দে সরস্বতী পুজোর আয়োজনে নামতে হবে যে।

পুজো সংখ্যা কেমন লাগল, অনেকেই জানিয়েছ। খুব ভালো লাগছে। যারা এখনও জানিয়ে উঠতে পারোনি তারাও জানাও। আমরা চাই তোমরা অনেক অনেক চিঠি লেখো। আমরা সবসময় তোমাদের সেরাটা দেওয়ারই চেষ্টা করছি। তোমাদের ভালো লাগলে আমাদেরও ভালো লাগে। এছাড়া তোমাদের আর কী কী চাই মন খুলে জানিও।

পূর্ব ঘোষণা মতো পুজো সংখ্যার পরে নভেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করা গেল না। তার প্রধান কারণ হল, ছাপাখানা এবং বাঁধাইয়ের কাকুরা একটু বেশি দিনের ছুটিতে ছিলেন। ঠিক তোমাদের মতোই। এই জন্যই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংখ্যাটি প্রস্তুত করা গেল না। ঘোষিত বিষয়বস্তু নিয়েই ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হল।

তোমাদের সহযোগিতায় পত্রিকার বন্ধু বাড়ছে দিনে দিনে। তোমাদের কথা মনে রেখেই আমরাও বাড়িয়ে দিলাম পাতার সংখ্যা। পত্রিকার দাম কিন্তু বাড়ানো হল না। এভাবেই ধাপে ধাপে বাড়বে পত্রিকার কলেবর। একদিন হয়তো রঙিনও দেখতে পাবে তোমাদের প্রিয় পত্রিকাকে। এইজন্য চাই তোমাদের আরও সহযোগিতা। বন্ধুদের কাছে এই পত্রিকার কথা ছড়িয়ে দিয়ে তোমরাই সমৃদ্ধ করতে পারবে এই পত্রিকাকে।

ভালো থেকো সবাই। আজ এখানেই–

– তোমাদের দিদিভাই
১০ই অগ্রহায়ণ ১৪১৯



সম্পাদনা
দীপালি রায়

অলংকরণ
অমর লাহা

গ্রাফিক্স
মানিক রায়

কার্যালয়
'প্রাণ বাগিচা'
সোদপুর রবীন্দ্র নগর
ডাক্তার বাগান
কলকাতা – ৭০০ ০৮২

সম্পাদকীয় বিভাগ
৯০০৭৭ ৬৭৫৫১
বিজ্ঞাপন
৯৮৩১৬ ৩০৮০৩
বিপণন
৯০৫১৬ ২৫৯৯৩

প্রধান পরিবেশক
মোঃ সাবির আনসারি
১, ডেকার্স লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
৯৮৩১৩ ৬০২৯৯

e-mail :
chhelebela@gmail.com



বাবলু আর গাবলু
জুরান নাথ
বাবলুকে সারপ্রাইজ দিতে হবে।
উরিবাবা ! গাবলু অমন হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে কোথায় দেখতে হচ্ছে।
SHOP
উপস ! গাবলু দেখছি জম্পেস একখানা ব্যাট কিনেছে !
আমি ওর সঙ্গে একটু হকি খেলতে চাই। হাঃ হাঃ
ওর-ফ-স ! ক-ক্কী !!
বাবারে !
মরেছে ! হাত ফসকে ব্যাটটা পুলিশকে ঘায়েল করেছে !
স-স্যরি পুলিশকাকু ! ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল।
আশা করি দ্বিতীয়বার এটা আর হবে না।


ওঃ হোঃ হোঃ ! হাঃ হাঃ !
পরে
বাবলুটা গেল কোথায় ! মাঠের দিকে একবার খুঁজে দেখি।
এবারে ব্যাটাকে ফাইনাল টাচ্ দিতে হবে! হিঃ হিঃ
এই কলার খোসায় একবার পা পড়লেই–
ইর-র-ক ! গেছি !
ক্যাচাৎ !
ওপাশে
উফস্ ! এখানে বসে একটু জিরিয়ে নিই !
হোঁপত ! গেছি রে !
ফটাস !
আবার তুই ! আশা করি আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না !
হাঃ হাঃ হাঃ
ইক !
ইস-স !! আজ তোর জন্মদিন তাই ব্যাটটা তোকে গিফট্ করব বলে এনেছিলুম রে ! কিন্তু –
ওহ ! না–আঁ !-আ

তাঁর সূর্যাস্তের মতো



তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, সেই সময়েই কাকাবাবুর সাথে পরিচয়। হঠাৎ একদিন স্কুলে দেখি আপ্পুকে ঘিরে খুব হুল্লোড় ক্লাস জুড়ে, ও জ্যোতিষী হয়ে গেছে। হাত দেখে হুবহু অতীতের কথা মিলিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে জ্যোতিষবিদ্যাটা আয়ত্ব করল ও ! রহস্যের সমাধান করতে গিয়েই দেখলাম, ওর ব্যাগে কাকাবাবুর গল্প সমগ্র। কাকাবাবুর গল্প পড়েই জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ব করেছে বুঝতে বাকি রইল না। সেই থেকেই কাকাবাবুর কিছুটা ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম।

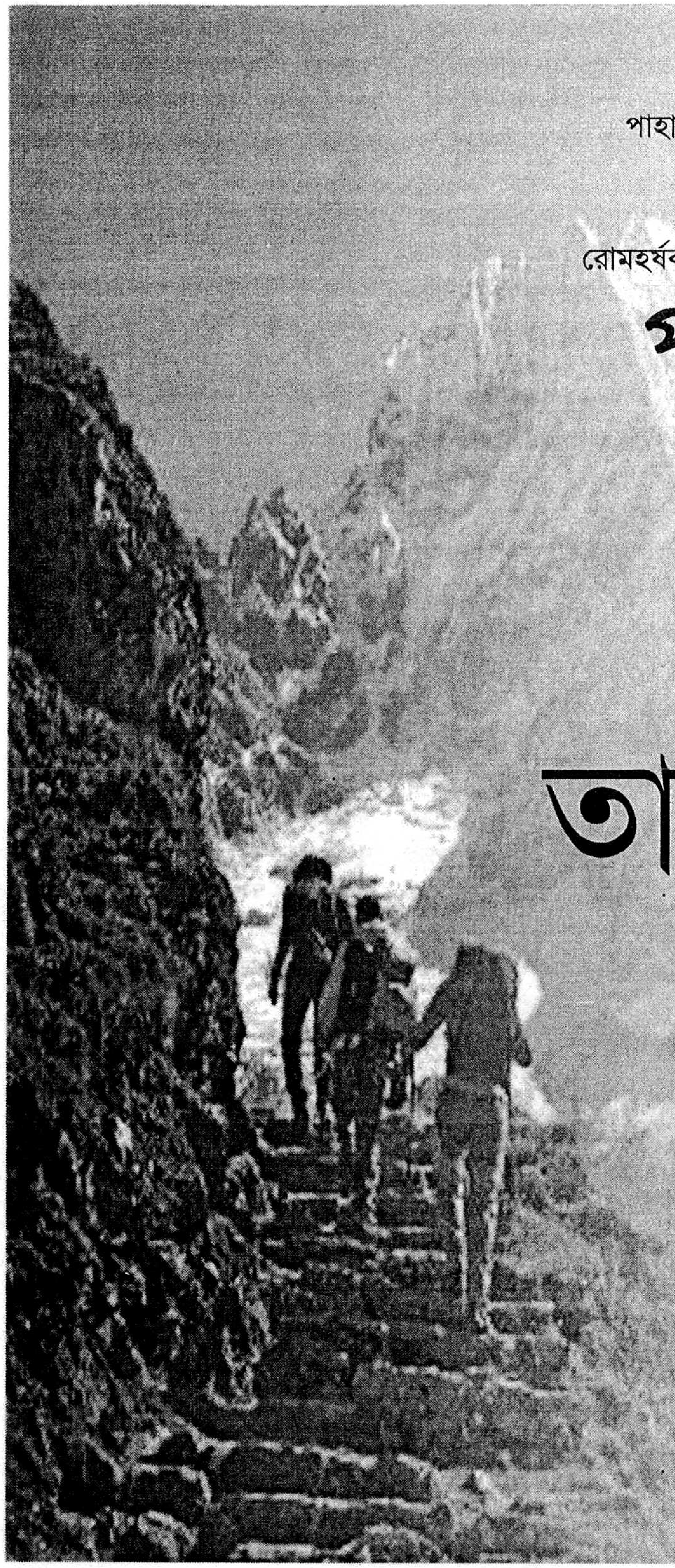
মানব মণ্ডল

কাকাবাবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এমন একটি চরিত্র যাকে কোনোদিনই কাল্পনিক বলে মনে হয় না। অবসরপ্রাপ্ত মধ্যবয়সী প্রতিবন্ধী অসম্ভব এক সাহসী মানুষকে ভাইপো সন্তু আর তার বন্ধু জোজোকে নিয়ে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'নীলমূর্তির রহস্য', 'জোজো অদৃশ্য'-র মতো বিভিন্ন কাহিনিতে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছে তারা। মজার ব্যাপার বেশিরভাগই গল্প-উপন্যাসে সুন্দরভাবে সেইসব জায়গার ভূগোল-ইতিহাস-সংস্কৃতির কথা বলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

শুধু 'কাকাবাবু'র স্রষ্টা নন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গত চারদশকের সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক ছিলেন। সাহিত্যের কৃতিত্বের জন্যে ২০০২-এ কলকাতার শেরিফ করা হয়েছিল তাঁকে। সাহিত্য অকাদেমি, দু-দুবার আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত এই মহান সাহিত্যিকের সম্পাদনায় 'কৃত্তিবাস' বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিশা দিয়েছিল। সাহিত্য অকাদেমির মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে ভারতের সাহিত্য চর্চায় তাঁর অবদান যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই রাজ্যে শিশু -কিশোর আকাদেমির সভাপতি থাকাকালীন তাঁর প্রিয় বই 'মহাভারত' ছোটোদের জন্য নতুন করে 'আমাদের মহাভারত' লেখা ছিল এক অমূল্য সৃষ্টি। যদিও তা শেষ করে যেতে পারলেন না।

১৯৩৪ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর বাংশাদেশের ফরিদপুরে জন্ম। চার বছর বয়সেই কলকাতায় আসেন। পড়শোনা শুরু হয় উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের পাড়ার টাউন স্কুলে। এই স্কুলেই তাঁর বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মাস্টারমশাই ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, মতিঝিল কলেজে গ্র্যাজুয়েশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ করেন। জাহাজের খালাসী হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও কর্ম জীবনের সূচনা হয় ইউনিস্কোতে। পরে নিউ ইন্ডিয়া ইন্সোরেন্সে চাকরি করতে গেলেও করেননি। পরবর্তী সময় সাহিত্য চর্চা নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের আকাশে অনেক নক্ষত্রই আছে। তবে ২৩শে অক্টোবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু যেন সূর্যাস্তের মতো।



পাহাড়ের ভূত, পাহাড়ের মজা, পাহাড়ের বিপদ, পাহাড়ের হিংস্র জীবজন্তু, পাহাড়ের দুঃখ, পাহাড়ের আনন্দ, পাহাড়ের আরো কিছু রোমহর্ষক কাহিনি। পাহাড়ের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়ে

পাহাড়ের গল্প

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

তাতাই, টুকাই, বুনি, তিথি, বলাকারা ঘিরে ধরেছে সমুদাকে। ওরা সকলে সমুদার কাছে পাহাড়ের গল্প শুনবে। আর পাহাড় মানে হিমালয়। সমুদা প্রায়ই হিমালয়ে চলে যায় কোনো না কোনো অভিযানে, তাই এই আবদার।

সমুদা এক কাপ চা খেয়ে শুরু করল–

পাহাড়ের সরলতা

শোন, গল্পটা শুনেছিলাম বিকাশকাকুর কাছে। বিকাশকাকু আজ অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু তখন তিনি সদ্য যৌবনে পা দিয়েছেন। কয়েকজন বন্ধু মিলে পা বাড়িয়েছেন সান্দাকফু ফালুট হয়ে সিঙ্গালীলা পাসের পথে। পথঘাট তখন তেমন উন্নত হয়নি। পাহাড়ে জনবসতি তখন আরও অনেক কম ছিল, জঙ্গল ছিল আরও গভীর, বন্য পশুর যাতায়াত ছিল অবারিত।

দিন কয়েক চলার পর খারাপ আবহাওয়ার জন্য সেদিন তাদের বেরোতে দেরি হয়ে গেল। গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু চড়াই পথ। শুরু হল তুষার-ঝড়। ঝড়ের ঝাপটে সবকিছু যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে, সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রায়

‘এভারেস্টটা সেখানে আছে বলেই তো যাওয়া’। হিমালয়ে আছে ত্যাগ-শৌর্য-আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-দর্শন আর অপার্থিব সৌন্দর্যের অনাবিল আনন্দ ! তাই তো যুগে যুগে মানুষ ঘর ছেড়ে বেছে নিয়েছে হিমালয়ের পথ।

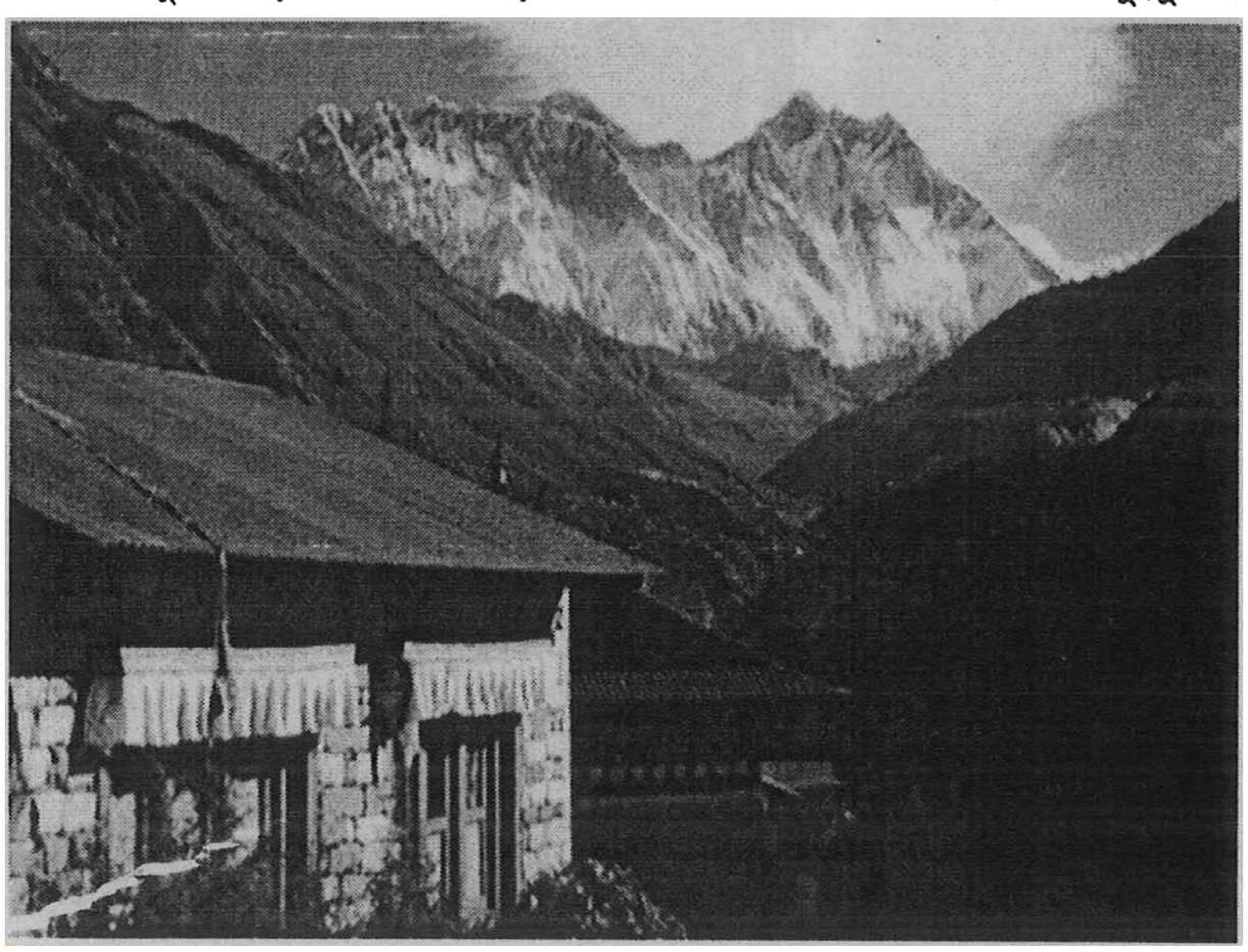
ঘন্টা পাঁচেক কোনোরকমে চলার পর কাকুদের চারজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন দল থেকে। চলতে চলতে হঠাৎ পথ মিলিয়ে গেল পাহাড়ের খাদে। ওঁরা বুঝলেন পথ হারিয়েছেন। ওঁরা পাগলের মতো পথ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু যতই পথ খোঁজেন, গোলক ধাঁধার মতো পথ ততই হারিয়ে যায়। বাড়তে থাকে তুষার-ঝড়, এর ওপর আছে জংলি জানোয়ারের ভয়। শুধু টর্চের আলোর ওপর ভর করে চলল পথ খোঁজা। কিন্তু পথ পাওয়া গেল না। শেষে ঠিক হল ওঁরা গাছে উঠে কোনোরকমে রাত কাটাবেন। কিন্তু সমস্যা হল ওঁদের কাছে শীতের ভারী পোশাক, স্লিপিং ব্যাগ কিছুই নেই। শীতের প্রকোপে রাত পোহানোর আগেই ওঁরা মারা পড়বেন। হঠাৎ ওঁদের এক বন্ধু একটা ঝোপে বেশ কয়েকটা ছোটো লুঙদার অর্থাৎ চৌকোনা প্রার্থনা পতাকা দেখতে পেলেন। সেই বন্ধু লাফিয়ে উঠে বললেন– এই দ্যাখ লুঙদার ! লুঙদার যখন আছে, কাছে পিঠে– জনবসতিও নিশ্চয় আছে !

আবার চলল খোঁজা। সেই প্রবল শীতে, ঝড়ের মধ্যে পাওয়া গেল একটা বাড়ি। আনন্দে ছুটে গেলেন ওঁরা বাড়িটার দিকে। বাড়িটার বিভিন্ন ফাঁক ফোঁকড় গলে বেরিয়ে আসছে আলোর ছটা। বিকাশ কাকুরা বাড়িটার সামনে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিল না। এবার চারজন মিলে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারলেন, চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, ‘আমরা পর্বতারোহী, আমরা তুষার ঝড়ে পথ হারিয়েছি, আমাদের বাঁচান। আমাদের খাবার দিন, আমাদের জল দিন...।’

কিন্তু ভেতর থেকে কোনো উত্তর এল না। ওঁরা বুঝতে পারছেন যে ভেতরে লোক আছে এবং তারা জেগে আছে কিন্তু কেউ কোনো টু শব্দটি করছে না। শেষে পলিথিন সিট পেতে বরফ মেশানো অল্প জল সংগ্রহ করে সেটা গলায় ঢেলে বিকাশকাকুরা বাড়ির বারান্দায় ছেঁড়া চট পেতে কোনোরকমে শুয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে আসছে। পূবাকাশে লাল সূর্য উঠেছে। হঠাৎ কাদের আওয়াজে কাকুদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ হাতে ধূমায়িত চায়ের মগ নিয়ে ডাকছেন– সাব উঠিয়ে, চায় পিজিয়ে। পাশে তার বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবক ছেলে। গতরাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, আর বললেন– না, আমরা কিছুই খাব না। কাল আমরা মরতে মরতে বাঁচলাম, আমাদের একটুও সাহায্য করলেন না। আর আজ এসেছেন আমাদের সেবা করতে ?

গৃহস্বামী অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন, আর বললেন– আপানার আমার মেহেমান। আপনারা কিছু না খেলে আমার অকল্যাণ হবে। ঘরের অন্যান্যরাও অতি বিনয়ী ও নাছোড়। শেষে বাধ্য হয়েই কাকুরা চা খেলেন। চা খাওয়ার পরে এল চমরি গাইয়ের গরম দুধ, তারপর রুটি, ভেড়ার মাংস, বাঁধাকপির তরকারি ও চাটনি। খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে গৃহস্বামী নিজে পথ দেখিয়ে ওনাদের পৌঁছে দিলেন টুংলুতে।



টাকা পয়সা দিতে গেলে গৃহস্বামী কিছুতেই নিলেন না। বারবার বলতে লাগলেন– আপনারা আমার মেহেমান, মেহেমানের কাছে কী কখনো পয়সা নিতে হয় ?

চলতে চলতে তাদের অতিথিসেবার আতিশয্য দেখে বিকাশকাকু জিজ্ঞাসা করলেন– আচ্ছা, আজ আপনারা এত খাওয়ালেন, এত যত্ন করলেন কিন্তু কাল আপনাদের এত ডাকলাম, এত চিৎকার করলাম, আপনারা একবারও বেরিয়ে এলেন না, টুঁ শব্দটি করলেন না। কেন বলুন তো ? আপনারা জেগেছিলেন, ঘরে আলো জ্বলছিল। আপনারা কেন এলেন না বলুন তো ?

গৃহস্বামী আমতা আমতা করে বললেন– সাব, আমরা সব ... জানতাম। আপনারা শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে এসেছেন, খাবার চেয়েছেন, জল চেয়েছেন, সব জানতাম। কিন্তু সাহস হয়নি উত্তর দিতে ! ভয়ে বেরোইনি আমরা।–

– সাহস হয়নি ? ভয়ে বেরোননি ? মানে ?

গৃহস্বামী হাত মুখ কচলে বললেন– সাব, আমরা ভয়ে দরজা খুলিনি। এখানে সাব বহুৎ ভূত-প্রেত-দানো আছে। ভূতের ভয়ে আমরা সন্ধ্যা হলেই দরজা জানলা লাগিয়ে ঘরে ঢুকে যাই। এবার তিনি বড়ো বড়ো চোখ করে বললেন– সাব, সন্ধ্যা হলেই ভূতেরা এখানে ঘুরে বেড়ায়। ওরা ঘরের সামনে এসে দরজায় ধাক্কা মেরে বাড়ির লোকজনেদের নাম ধরে ধরে ডাকে। আর ভুল করে একবার সাড়া দিলেই ব্যাস ! ভূতটা তখন তাকে পাহাড়ের আড়ালে ধরে নিয়ে গিয়ে সব রক্ত চুষে নেয়।– বলে, গৃহস্বামী বারকয়েক সভয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করলেন।

সমুদার মুখ থেকে গল্পটা শুনে বুনি জিজ্ঞাসা করল– পাহাড়ে অপদেবতা থাকে, দেবতা থাকে না ?

পাহাড়ের দেবতা

হিমালয় দেবভূমি, সকল ধর্মের মানুষ হিমালয়কে দেবস্থান হিসাবে মানে। গাইড পোর্টরা বলে হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতে হিমালয়-কন্যা পার্বতী নাকি লাল পেড়ে শাড়ি পরে, এলোচুলে, ছোট্ট বালিকার বেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। ভাগ্যবান লোকেরা নাকি কখনো কখনো দেখতেও পায়। আমি ভাগ্যবান নই। তবে হিমালয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু পৌরানিক উপাখ্যান।

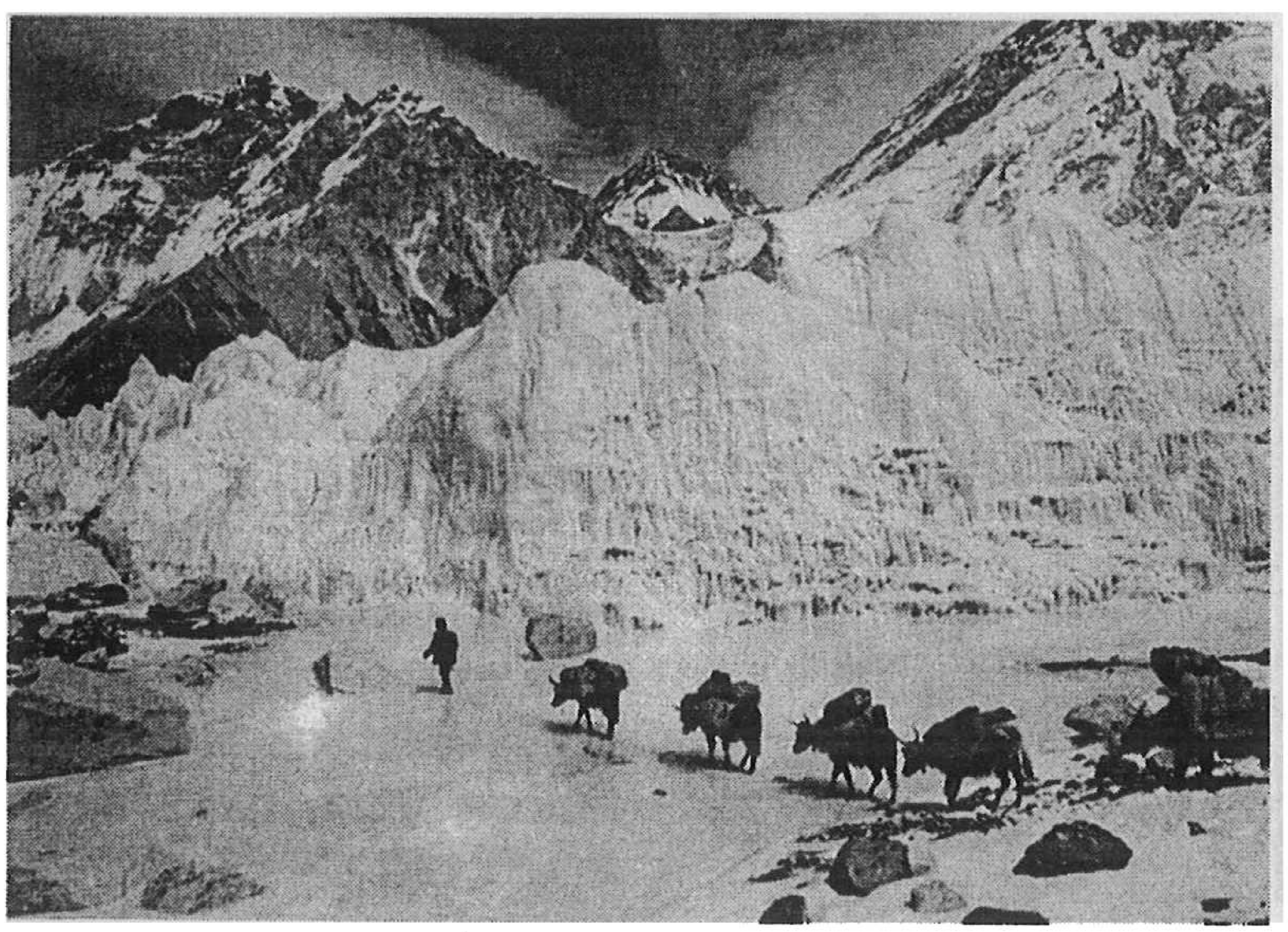
পাহাড়ের পুরাণ

একটা ঘটনা বলছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ। ভীমের গদার প্রহারে উরু ভেঙে মারা গেছেন দুর্যোধন। জয়ী হল পাণ্ডবরা। বিজয়ী পাণ্ডবরা তাড়া করতে লাগল পরাজিত কৌরবদের। ভীত, পরাজিত কৌরব সেনাকুল পালাতে লাগল হস্তিনাপুরের দিকে কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। ওরা ধরল যমুনার উজান। আগে পলায়মান কৌরবকুলের লোকজন, পেছনে পাণ্ডবরা। ওরা পালাতে পালাতে যমুনেত্রীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। প্রাণ ভয়ে কৌরবরা উঠে গেল পাহাড়ের ওপরে। পাণ্ডবরা রয়ে গেল পাহাড়ের নীচে। পাণ্ডবরা আর ওপরে উঠতে পারল না, কারণ পাহাড়ের ওপরে যারা থাকে যুদ্ধে তারাই এগিয়ে থাকে। আজও 'হর-কি-দুন' এর পথে দেখা যায় এই কৌরব-পাণ্ডবদের উত্তরসূরীদের। সেখানে আজও আছে কর্ণ ও দুর্যোধনের মন্দির। রীতিমতো দেবতাজ্ঞানে পূজিত হন তাঁরা। ডাঁটমির, গঙ্গাড়, সীমা ও ওসলা, এই সমস্ত তমসা উপত্যকায়।

তাতাই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল– শুনেছি, হিমালয়ে অনেক আপদ-বিপদ হয় !

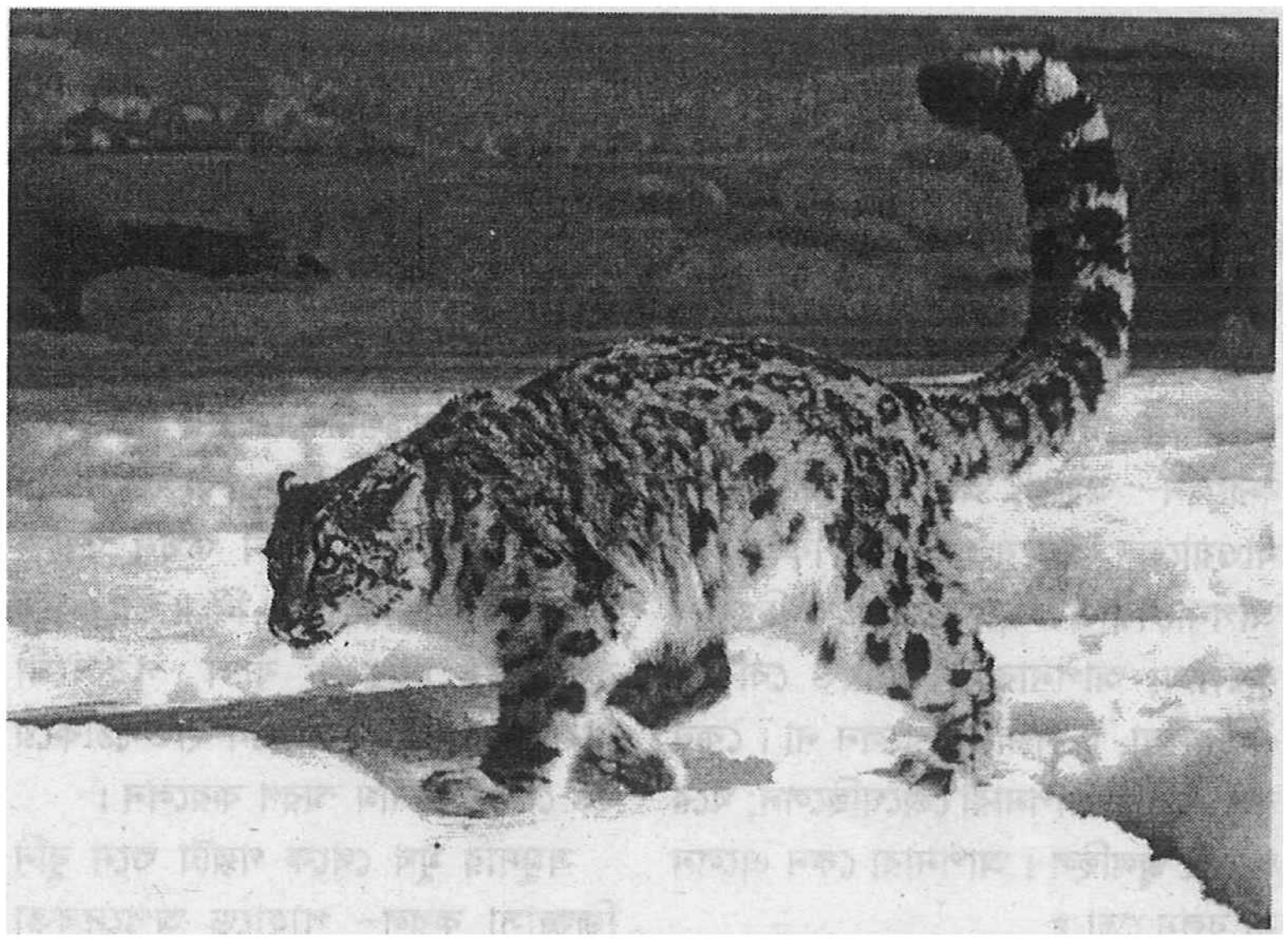
পাহাড়ের বিপদ

– ঠিক বলেছিস। শোন, সেবার আমরা চলেছি রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড হয়ে রন্টি স্যাডেল। সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম রূপকুণ্ডে। রূপকুণ্ডে প্রচুর কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। রূপকুণ্ড নিয়ে কয়েকটা তথ্য ও গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে রাজার অন্যায়ে খেপে গিয়ে মাতা নন্দা দেবী নাকি তুষার ঝড়ে সকল রাজকর্মচারীদের শুইয়ে দেন চিরতুষারের নীচে। এগুলো নাকি তাদেরই কঙ্কাল। আবার অন্য মতে



পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত থেকে আসা বিদেশী বাহিনীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে মৃত সৈনিকদের দেহ এগুলো। তবে প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে বড়ানন্দাজাত বলে বিশাল উৎসব হয়। এই উৎসবে হাজার হাজার নারী-পুরুষ যোগদান করেন, যেতে হয় রূপকুণ্ড পেরিয়ে, জিওনার গলি কল অতিক্রম করে বড়াহোম কুণ্ডে। অনেকে যেতে পারেন, অনেকে পারেন না। তবে এই সময়ে এই অঞ্চলে নাকি চার শিং-ওয়ালা একটি ভেড়ার জন্ম হবেই। এই ভেড়াটিকে উৎসর্গ করা হয় মা নন্দাদেবীর উদ্দেশ্যে এবং পূজাপাঠের পর বড়াহোম কুণ্ডে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

তারপর এই ভেড়াটিকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় যায় কে জানে ! আমরা জিওনার গলি কল অতিক্রম করে, শৈল সমুদ্র হিমবাহ পেরিয়ে দোদাং থেকে সেদিন যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের গাইড বলল– সাব আজকা মৌসম ঠিক নেহি হ্যায়। বাপাস জানা ঠিক হ্যায়। কিন্তু দলের প্রবীনতম সদস্য গিরিদা ভাবলেন, গাইড-পোর্টরা হয়তো এড়িয়ে যাবার ফন্দি আঁটছে। তাই গাইডের কথায় কান না দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আগে। দূরে নন্দাঘুন্টির পাশে জমাট বাঁধা কালো মেঘ দ্রুত বড়ো হতে লাগল, চক্রাকারে বিস্তৃত হল দিগন্তে। আমরা অনুভব করলাম মেঘের গতি প্রকৃতি। দৈত্যরূপী মেঘ ব্লিজার্ডের আকারে দ্রুত ছুটে আসছে। আর সময় নষ্ট নয়, দ্রুত যাত্রা পথের মুখ ঘুরিয়ে আমরা ছুটতে লাগলাম পূর্বের পথ ধরে হিমবাহের ওপর দিয়ে। হাওয়ার দাপটে ছোটো ছোটো পাথর উড়ে আসছে। সেদিন আমরা পাহাড়ে হাঁটিনি, দৌড়ে ছিলাম। তাই বেঁচে গিয়েছিলাম হিমালয়ের রুদ্ররোষ থেকে। নয়তো আমাদের দেহগুলো পড়ে থাকত বরফের নীচে।



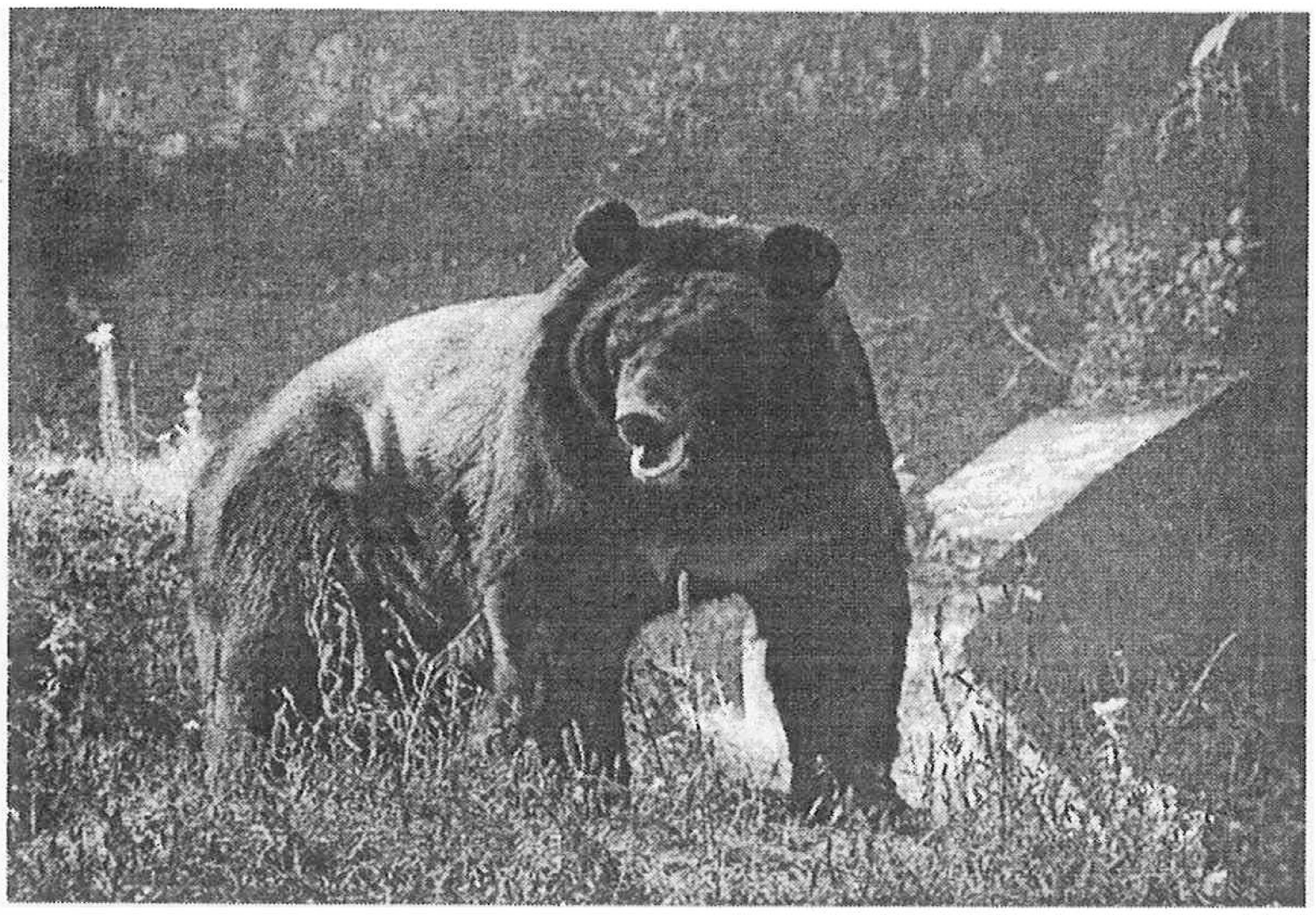
আমরা বাঁচলেও বাঁচেননি ভাস্করদা। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাস। দলনেতা ভাস্করদা সাতজন সঙ্গী সহ চলেছেন লাদাক হিমালয়ের পারাংলা অভিযানে। গাইড পোর্টারদের অসহযোগিতায় তাঁদের পারাংলা পৌঁছতে বিকাল চারটে হয়ে গেল। প্রকৃতির অবস্থা তখন খুব খারাপ। চারিধারে শুধু বরফ আর বরফ। এরই মধ্যে শুরু হল তুষার ঝড়। এই ভীষণ আবহাওয়ার মধ্যেও তারা এগিয়ে গেল পারাংলা-টপের দিকে। যেটা একদম ঠিক হয়নি। দলনেতা ও অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ভাস্করদা দলের সকলকে পারাংলা অতিক্রম করিয়ে দিলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে ; শুধু পারলেন না তাঁর আর বাকি দুই সঙ্গীর জীবন বাঁচাতে। শেষে বেঁচে যাওয়া অভিযাত্রী ফিরে এসে জানায়, তুষার ঝড়ের এক দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় ভাস্করদাকে। পরে উদ্ধারকারী দল তিনজনের দেহ উদ্ধার করে পারাংলা গিরিবর্ত্মে।

মৃত্যুর কাহিনী শুনে ছোটোগুলোর মন খারাপ হয়ে গেল তাই সমুদা চট করে বলল– শোন, এবার একটা বিপদ-মুক্তির ঘটনা বলি।

হঠাৎ কোত্থেকে এক বিশালাকার ভাল্লুক এসে হাজির ডাক্তারবাবুর সামনে। ডাক্তারবাবু ভয় পাবেন কি, তিনি ভাল্লুকের ছবি তুলতে লাগলেন। ভালুকমামা অপমান বোধ করলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন– কি, এত বড়ো আস্পর্ধা, আমি সামনে আসতেও ভয় নেই সামান্য মানুষের ?

পাহাড়ের বিপদমুক্তি

সেবার আমরাও চলেছি সান্দাকফু-ফালুট হয়ে সিঙ্গালীলা পাস অতিক্রম করে সিকিমের উত্তরে, গ্রামে। সময়টা জানুয়ারি মাস। সান্দাকফু পুরো বরফে



মোড়া, সেখানে মাটি দেখা যাচ্ছে না। সান্দাকফু থেকে ফালুট একুশ কিলোমিটার, পুরো রাস্তাটা বরফে মোড়া। আমাদের গাইড অর্জুন গ্যানোর, গ্যানোর করতে করতে অগ্রসর হল আগে, কিন্তু কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর আর যাওয়া গেল না। আরও আগে নাকি পাঁচ-ছয় ফুট বরফ পড়ে আছে, অতএব প্রত্যাগমনায়চ। সান্দাকফু ফিরে ঠিক হল, আমরা গুড়দুম, শ্রীখোলা হয়ে ফিরব ম্যানেভঞ্জনে। কিন্তু গুড়দমের রাস্তাই বা কম কিসে ? সেখানেও প্রচুর বরফ, তার ওপর ঘন জঙ্গল। প্রায়ই হামাগুড়ি দিয়ে, বুক ছেঁচড়ে চলতে হচ্ছে রাস্তায়। সামনে ঢালু রাস্তা, তার ওপর আবার আরম্ভ হল তুষারপাত। ছয়জন সঙ্গীর মধ্যে একজন ছিলেন খুব বয়স্ক স্থূলদেহী, তাই তাঁকে ধরে ধরে নামানো হচ্ছিল। ওনাকে নামাতে সময় লাগছিল প্রচুর। উৎকণ্ঠিত অর্জুন শেরপা তাই ঠিক করল আমাদের মধ্যে একজন তার সাথে এগিয়ে গিয়ে ট্রেকারহাট ও খাবার দাবার ঠিক করে রাখবে।

দুজন এগিয়ে গেল। সামনে-পেছনে আমরা আরো পাঁচজন। হঠাৎ দেখলাম, বরফের ওপর কোনো পশুর সদ্য পায়ের ছাপ। পাঁচজনের একজন আবার পাহাড়ের মানুষ, সে বলল– এতো স্নো লেপার্ডের পায়ের ছাপ ! আরও কয়েক পা যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম ছাপ চারটে নয় আটটা, অর্থাৎ পশু একটা নয় দুটো। সর্বনাশ, ওরা আবার আগের মানুষদুটোকে অনুসরণ করছে না তো ? পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে দুটো আমাদের থেকে বেশি দূরেও নেই। রাস্তায় বাঁক অবিরত ; রাস্তার বাঁক পেরোতে গিয়ে মনে হচ্ছে সে দুটো হয়তো ওৎ পেতে বসে আছে ! যে কোনো সময় হালুম করে ঘাড়ে এসে পড়বে। যত এগোচ্ছি বরফের ওপর পায়ের ছাপ তত স্পষ্ট হচ্ছে। একটা সময় বরফের ছাপের ভেতরে বরফের কুঁচির নড়াচড়াও দেখতে পেলাম। সর্বনাশ ! তাহলে উপায় ? রুকস্যাক থেকে কয়েকটা জামা-কাপড় ও দেশলাই বের করে হাতে রাখলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল এল, শ্বাপদরা দলবদ্ধ মানুষের চিৎকার পছন্দ করে না, ভয়ও পায়। অতএব শুরু হল চিৎকার ও বেসুরো খেয়ালি গান। কিন্তু বাঘ বাবাজীরা নাছোড়বান্দা, ওদের পায়ের ছাপ আমাদের আগে আগে এগিয়েই চলেছে। শেষে বিপদ বুঝে থালা ও মগ বের করে বদখেয়ালি গানের সাথে শুরু হল ঝম্‌ঝমাঝম্‌ 'মিউজিক অর্কেস্টা'। একসময় দেখি সেই ছাপগুলো আর নেই ! তার মানে আমাদের বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে বাবাজীদ্বয় ভয় পেয়ে কেটে পড়েছে। আরও ঘন্টাখানেক চলার পর একটা বুনিয়াল অর্থাৎ তৃণক্ষেত্র পেলাম। সেখানে বরফ একটু কম। আমাদের অগ্রবর্তী সাথীদের সেকথা বলতেই বলল– হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঘন্টাখানেক আগে আমরা যখন জঙ্গল অতিক্রম করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল, পেছনে কিছু যেন অনুসরণ করছে। সে কথা আমি অর্জুন শেরপাকে বলেওছিলাম।

অর্জুন খালি বলল– জঙ্গলমে খতরা হ্যায়, জলদি চলিয়ে !

তিথি দুষ্টু-মিষ্টি সুরে বলল– ওফ্ঃ ! চিতা দুটো কাছে এলে কি মজাই না হত।

পাহাড়ের মজা

সমুদা চোখ মটকে বলল– তাহলে একটা মজার গল্প বলি।

সেবার আমরা নেমে আসছি নীচে। আসলে পাহাড়ে তো ভালো খাবার পাওয়া যায় না, তার ওপর ট্রেকিং-এর শেষে খুব খিদে পায়। পথে একটা হোটেল পেয়ে সকলে ঢুকলাম। মাথা পিছু ত্রিশ টাকায় পেট চুক্তি খাওয়া। অর্থাৎ ওই টাকায় যত পারো খাও। শুরু হল কাজলদা ও স্বপনদার মধ্যে খাওয়ার প্রতিযোগিতা। এ যত ভাত খায় তো অন্য জন আরেকটু এগিয়ে যায়। উভয়ের চারবার ভাত নেওয়া হয়ে গেছে। যে খাবার দিচ্ছে সে একটা কিশোর। একবার সে খাবার দেয় আর মালিকের দিকে তাকায়। মালিকের কাঁদো কাঁদো মুখ। কাজলদাও স্বপনদার নির্বিকার মুখ থেকে খালি আওয়াজ উঠছে সুরুৎ... সুরাৎ...। পঞ্চমবার ভাত নেওয়ার পর বেচারা মালিক আর থাকতে পারল না। সে বলেই ফেলল– খাও, খাও, আউর খাও, লেকিন ইহাঁ ইয়ে রাক্ষস জ্যায়সা খানা নেহি মিলেগা ! অ্যায়সে আর

দু-চারটে মিলে তো হাম ভিখারী হো জায়েগা !

ছোটোগুলো হো হো করে হেসে উঠল। হাসির রেশ শেষ হতেই সমুদা বলে উঠল– পাহাড়ে অন্য বিপদও আছে।

পাহাড়ের হিংস্র জন্তু

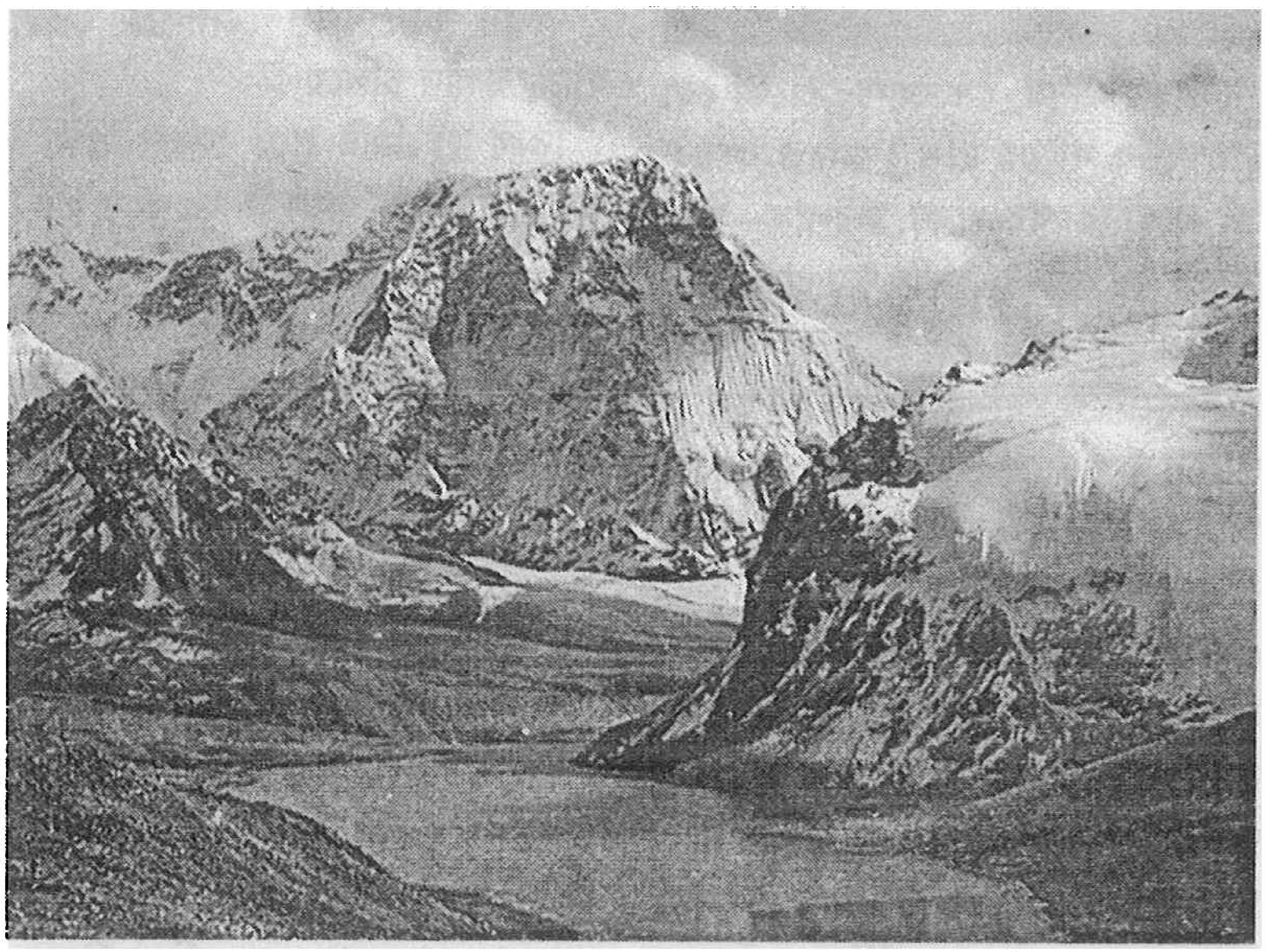
বহু বছর আগে এক ডাক্তারবাবু তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চলেছেন গাড়োয়ালের ডোডিতালের দিকে, পথে গভীর জঙ্গল। ডাক্তারবাবুর আবার ফটোতোলার নেশা। হঠাৎ কোত্থেকে এক বিশালাকার ভাল্লুক এসে হাজির ডাক্তারবাবুর সামনে। ডাক্তারবাবু ভয় পাবেন কি, তিনি ভাল্লুকের ছবি তুলতে লাগলেন। ভালুকমামা অপমান বোধ করলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন– কি, এত বড়ো আস্পর্ধা, আমি সামনে আসতেও ভয় নেই সামান্য মানুষের ? ভাল্লুকমামা রেগে মেগে মারলেন এক থাবা। মামার থাবায় ফালা ফালা হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর মুখের চামড়া। প্রথমে খেয়াল না করলেও পরে তেড়ে এল সঙ্গীরা। শেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের হাতে নিজের গাল সেলাই করতে হল।

তাতাই বলে উঠল– ইস্, ডাক্তারবাবুটা কি বোকা ! ভাল্লুক দেখে কেউ ফটো তুলতে যায় ? আমি হলে এক দৌড়ে পালিয়ে যেতাম।

টুকাই বলল– পালিয়ে যাব বললেই কী পালিয়ে যাওয়া যায় ? জানিস সেখানে কি উঁচু উঁচু রাস্তা ! কত বরফ !

পাহাড়ের সৌন্দর্য

সমুদা বলল– ঠিকই বলেছিস, পালিয়ে যাব বললেই হিমালয় থেকে পালানো যায় না। হিমালয়ের টান বড়ো সাংঘাতিক, বড়ো নেশা। হিমালয়ের তুষারশুভ্র শৃঙ্গে যখন প্রভাতী সূর্যের আলো পড়ে তখন তার আকর্ষণ হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। সূর্যের পরিক্রমার সাথে সাথে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে হিমালয়ের সৌন্দর্যের পরিবর্তন ঘটে। কত মানুষ হিমালয়ের টানে ঘর সংসার ছেড়েছে, হিমালয়ের অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে হিমালয়ের পথে পথে। তবে এই হিমালয়ে বাঙালির অবদান কম নয়। হালে আমাদের সত্যব্রত দাম প্রথম বাঙালি হিসাবে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করলেও বাঙালি অতীশ দীপঙ্করই প্রথম হিমালয় অতিক্রম করে পাড়ি দেন তিব্বতে। বাঙালি রাধানাথ সিকদার পিক ১৫ বা মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রথম নিরূপণ করেন।



হঠাৎ মাঝখান থেকে তিথি বলে উঠল– সমুদা, শুনেছি তেনজিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারির আগে নাকি এভারেস্টে কেউ উঠেছিল ?

পাহাড়ের রোমহর্ষক কিছু তথ্য ও ঘটনা

– এটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন রে ! ১৯২৪ সালে এভারেস্ট অভিযানে অভিযাত্রী ম্যালরী ও আরভিন। সঙ্গী নোয়েন ওডেন এঁদের শেষ রকস্টেপ পর্যন্ত উঠতে দেখেন কিন্তু তারপর সবশেষ। ঘটে দুর্ঘটনা। ১৯৩০ সালে আরভিনের আইস-এক্সট্রা পাওয়া যায় ৮৪৪০ মিটার উচ্চতায়। আর ১৯৯৯ সালে ম্যালরীর দেহ পাওয়া যায় ৮১৫৫ মিটার উচ্চতায়। বোঝা যায় আকস্মাৎ পতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ম্যালরীর। পাওয়া যায়নি আরভিনের দেহ। সেই কোডাক ক্যামেরাটা পাওয়া গেলে হয়তো বোঝা যেত আরভিন ও ম্যলরী মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষে উঠে ছিলেন কিনা !

তবে তোদের কয়েকটা তথ্য জানিয়ে রাখি যেমন, আমাদের বাংলার মানুষ তেনজিং নোরগে, নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারির সাথে ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে সকাল ৯টায় প্রথম এভারেস্টে ওঠেন। আমাদের মাস্টার মশাই কুশাং শেরপা স্যার যিনি দার্জিলিং এর মানুষ, মাউন্ট এভারেস্টের চারটি ফেশ দিয়েই উঠেছেন। নোয়াং গোম্বু স্যার, ইনিও দার্জিলিং-এর লোক, পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি মাউন্ট এভারেস্টে দুবার ওঠেন। ইটালিয়ান পর্বতাভিযাত্রী রেনল্ড মেসনার পৃথিবীর সব কটি আটহাজারী পর্বতের, যাদের উচ্চতা আট হাজার মিটার বা তারও বেশি, সব কটাতেই চড়ে বসেছেন। জাপানি জুনকো টাবেই মহিলা অভিযাত্রী হিসাবে সর্বপ্রথম মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। আর প্রথম

ভারতীয় মহিলা হলেন বাচেন্দ্রী পাল। ফু দোরজি সর্বপ্রথম বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে চড়েন। তোরা জানিস কী, মাউন্ট এভারেস্টের অনেক নাম আছে ? নেপালীরা বলে, 'সাগর মাথা', তিব্বতীরা বলে, 'চোমোলুঙমা', আর চিনারা বলে, 'জুমুলাঙমা-ফেঙ'।

টুকাই শুনতে শুনতে বলল– আমরা দার্জিলিং গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, খুব সুন্দর ! সূর্যোদয় সেখানে আরও সুন্দর !

সমুদা বলল– তোরা যাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা বলিস নেপতারা বলে– 'কঙ-লো-চু', ভুটিয়ারা বলে– 'খুম্বু-করম', নেপালী-ভুটিয়া ভাষায় এর নাম 'কঙছেন', তিব্বতীরা বলে– 'গ্যানস-ছেন-জোড-লোঙ্গা' আর নেপালের আদিবাসীরা বলে 'খুম্বু-করম-ল্যাঙ্গুর'। পণ্ডিতদের মতে কাঞ্চনজঙ্ঘা কথাটা এসেছে তিব্বতী শব্দ ক্যাং-ছেন–দ্য-জঙ্ঘা থেকে, যার অর্থ বরফের পাঁচ কোষাগার। এদের বিশ্বাস সোনা, রূপা, রত্ন, শস্য ও অস্ত্রের পাঁচটি ভাণ্ডার রয়েছে এই পর্বতে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্থানীয়দের কাছে অন্যতম প্রধান দেবতা।

সমুদার কাছে অনেক তথ্য শুনে ওরা হাসাহাসি করছিল, কেউ গম্ভীরভাবে শুনছিল। এবার সমুদা বলল– শোন, শুরুটা করেছিলাম ভূতের গল্প দিয়ে শেষও করব তা দিয়ে তবে শুরুর গল্পে কোনো প্রমাণ নেই, তোরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিস। কিন্তু এটা তোরা উড়িয়ে দিতে পারবি না। সারা পৃথিবী এই ঘটনার সাক্ষী।

পাহাড়ের ভূত

নাঙ্গাপর্বতঃ স্থানীয়রা বলে দিয়ামির অর্থাৎ পর্বতের রাজা। জার্মানদের সাথে ব্রিটিশদের সম্পর্ক তখন সাপে নেউলে। তখনও পর্যন্ত কেউ উঠতে পারেনি নাঙ্গা পর্বতে। ১৯৫৩ সাল, জার্মানদল আবার শুরু করেছে নাঙ্গা পর্বত অভিযান। জার্মানরা এর আগে অনেক অভিমান করেছে এখানে, মারাও গেছে অনেকে। এই দলে ঢুকলেন অস্ট্রিয়ান অভিযানী হারমান বুল। জার্মান রেডিও বারবার সম্প্রচার করছে অভিযাত্রীদের অভিযানের খতিয়ান। চতুর্থ ক্যাম্পে পৌঁছে গেল দল। খবর এল, ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল জয় করেছে মাউন্ট এভারেস্ট। হঠাৎ এল একটা ব্লিজার্ড বা তুষার ঝড়। অনেকে আহত হল। আহতরা ফিরে এল নীচে।

সেদিন ঝকঝকে আকাশ। কিন্তু দলনেতা হুকুম দিলেন পুরো অভিযাত্রীদলকে নীচে নেমে আসতে। অভিযাত্রীরা অমান্য করলেন দলনেতার আদেশ। ছিন্ন হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। আসলে দলনেতার দাদা উইলি মারকেল এই নাঙ্গা পর্বত অভিযানে মারা যান। যখন মারকেল মারা যান তখন দলনেতার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। দলনেতা কখনোই চাননি কোনো অভিযাত্রী এই নাঙ্গা পর্বত অভিযানে সফল হোক, যেহেতু তাঁর দাদা এই অভিযানে সফল হননি।



সে দিনই মধ্যরাত্রে একা অভিযান শুরু করলেন হারমান। কিন্তু পথ বড়োই কষ্টের, পিঠে ন্যাপস্যাক নিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। তাই ন্যাপস্যাককে পাথরের একটা খাঁজে রেখে জ্যাকেটের ভেতর ক্যামেরা ও আইস অ্যাক্স নিয়ে আবার শুরু করলেন হাঁটতে। বহু কষ্টে, চির-তুষারের ওপর দিয়ে একাই উঠে পড়লেন নাঙ্গা-পর্বতের শীর্ষে। পৃথিবীর মানুষের প্রথম পা পড়ল নাঙ্গা পর্বতের শীর্ষে।

এবার ফেরার পালা। জল নেই, খাবার নেই, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সারা শরীরে তুষার ক্ষত নিয়ে অবসন্ন হারমান ফিরে আসতে লাগলেন। আস্তে আস্তে রাত হয়ে এল। আর ফেরার উপায় নেই। হরমান একটা ঢালু পাথরে বসে পড়লেন, পড়ে গেলেই মৃত্যু ! এইভাবে কাটালেন সারারাত।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলল– সকাল হয়ে গেছে হরমান, ওঠো ! এবার চলা শুরু করো। আগন্তুকের ডাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মৃত্যুমুখী হরমান পেছনে তাকিয়ে দেখলেন সারা শরীর অভিযাত্রীর পোশাকে আবৃত এক দীর্ঘ দেহী পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। কোনোরকমে হরমান জিজ্ঞাসা করলেন– কে তুমি ?

আগন্তুক বললেন– বন্ধু, তোমার সহ-অভিযাত্রী।

হরমান বললেন– আমি আর পারব না, আমি শেষ, এবার আমি মারা যাব।

আগন্তুক বললেন– তুমি পারবে, তুমি এতটা যখন পেরেছ আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

বহু বোঝানোর পর হরমান উঠলেন। আস্তে আস্তে টলমল পায়ে চলতে লাগলেন, পেছনে আগন্তুক। কিন্তু এ পথ বড়োই বন্ধুর, বড়ো শক্ত। অবসন্ন, ক্ষুধার্থ, তৃষ্ণার্ত শরীর নিয়ে বেশি চলা সম্ভব নয়।

তুষারের ওপর দিয়ে আর তিনি চলতে পারছেন না, তাঁর আর চলার শক্তি

নেই। আগন্তুক প্রথমে বোঝালেন, তারপর ধমক দিয়ে বললেন– ওঠো হরমান, ওঠো... । তুমি পৃথিবীর মানুষকে বলবে না, তোমার অভিযানের কথা ! বলবে না তোমার বিজয়ী হওয়ার কথা ! তোমার বাড়ির লোকজন, তোমার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে, তাদের বলবে না, তোমার এই জয়লাভের কথা !

হরমান ও আগন্তুক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। হরমান আবার জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কে ?

আগন্তুক মুখের ঢাকাটা খুলে বললেন– চিনতে পারছ না ?

আগন্তুককে দেখে চমকে উঠলেন হরমান ! তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল– হা ঈশ্বর ! মারকেল !

বিষন্ন সুরে মারকেল বললেন– হ্যাঁ, উইলি মারকেল ! একজন অসফল অভিযাত্রী। তারপর হুকুম দিলেন– চলো, হরমান চলো ; ওয়াক... !

টলমল পায়ে চলতে লাগলেন হরমান। তিনি চলেন আর আছড়ে আছড়ে পড়েন, একটু বিশ্রাম নেন, আবার চলেন। হারমান পড়ে গেলেই পেছনে মারকেল ভারী গলায় বলেন– ওয়াক হারমান, ও..য়া..ক।

দলের সবাই নিশ্চিত হারমান মারা গেছে। বেসক্যাম্পে দলনেতাও বললেন– নাঙ্গা পর্বত আরও একজনের প্রাণ নিল।

চলতে চলতে একসময় মারকেল বললেন– সামনে দেখো হারমান।

হারমান দেখলেন, দূরে তাঁর বন্ধুরা মালপত্র গোছাচ্ছে, একজন ছবি তুলছে, আর একজন উইলি মারকেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাথরে ফলক গাঁথছে। আনন্দে নেচে উঠলেন হারমান। পেছন থেকে মারকেল বললেন– বিদায় হারমান।

হারমান মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন পেছনে কেউ নেই।

পাহাড়ের আনন্দ

তারপর অনেক ইতিহাস। হারমান ফিরে এলেন কিন্তু অভিযাত্রীদের অনেকে স্বীকৃতি দিতে চাইল না। স্বীকৃতি দিল না দলনেতা। এটা সম্ভব নাকি। যে মারকেলের কথা হারমান বলছেন, তিনি এই অভিযানের বহুপূর্বে মারা গেছেন। যে মারা গেছে সে কাউকে পথ দেখাতে পারে ? অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ! শোনা যায় ব্যাপারটা সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু ক্যামেরায় ছবি যে হারমানের হয়ে কথা বলছে ! শৃঙ্গ জয়ের স্বীকৃতি পেলেন হারমান।

পরিশেষে

সমুদা সব শেষে বললেন– এত কষ্ট, যন্ত্রণা, মৃত্যু সত্ত্বেও মানুষ বারে বারে ছুটে যায় হিমালয়ে ! কী আছে সেখানে ? ম্যালোরি বলেছিলেন, ‘এভারেস্টটা সেখানে আছে বলেই তো যাওয়া’। হিমালয়ে আছে ত্যাগ-শৌর্য-আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-দর্শন আর অপার্থিব সৌন্দর্যের অনাবিল আনন্দ !

হিমালয়ের টুকিটাকি

- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী – তেনজিন নোরগে(ভারত) এডমণ্ড হিলারী (নিউজিল্যান্ড)
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা – জুনকো তাবেই (জাপান)
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী ভারতীয় মহিলা – বাচেন্দ্রী পাল
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী বাঙালি – সত্যব্রত দাম
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী বাঙালি মহিলা – শিপ্রা মজুমদার
- প্রথম এভারেস্ট জয় করেন – ফু দোরজি
- বিনা অক্সিজেনে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম ব্যক্তি – নোয়াং গোম্বু।
- দুবার এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম ব্যক্তি – নোয়াং গোম্বু।
- ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ – গডউইন অস্টিন বা কে-টু
- পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান – সান্দাকফু
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ গ্রাম – কিব্বের (হিমাচল প্রদেশ)
- এভারেস্টের চারটি ‘ফেস’ দিয়ে উঠেছেন – কুশাং শেরপা
- প্রথম ব্যক্তি যিনি আবিষ্কার করেন এভারেস্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ – রাধানাথ শিকদার (২০১৩ সালে তাঁর জন্মের দ্বি-শত বর্ষ পালিত হবে)
- বিশ্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ – গডউইন অস্টিন (কে-টু) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা
- বিশ্বে আট হাজার মিটার বা আরও বেশি উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গের সংখ্যা – ১৪টি (যেমন- এভারেস্ট, মাকালু, নাঙ্গাপর্বত, লোৎসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি)
- উপরোক্ত চোদ্দোটি শৃঙ্গই আরোহন করেছেন – রেনল্ড মেসনার
- বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান – দ্রস (জম্মু ও কাশ্মীর) (প্রথমটি ভারময়ানস্ক, সাইবেরিয়া)

তাই তো যুগে যুগে মানুষ ঘর ছেড়ে বেছে নিয়েছে হিমালয়ের পথ।

ভেদিয়ার ভেদো বামুন



ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান জেলার ভেদিয়া গ্রামে ভেদো বামুন নামে এক পেটুক বামুন থাকত। পুজো আর্চার বিশেষ কিছুই সে জানত না। তবুও এর ওর বাড়ি অং নমো বং নমো করে পুরুতগিরি করত। তাতেই কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যেত তার।

ভেদিয়া ছিল তখন বনময় অজ গ্রাম। চারদিকে ঝোপ ঝাড় বড়ো বড়ো গাছপালায় ভর্তি। পাকা বাড়ি একটাও ছিল না। যা ছিল তা মাটির ঘর, খড়ের চালা, ছিটেবেড়া ইত্যাদি। ভেদো বামুনের একটাই রোগ ছিল বিনা নিমন্ত্রণে লোকের বাড়ি খেতে যাওয়া। কার বাড়ির ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন, কার উপনয়ন, বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি কোনো কিছুই বাদ দিত না সে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে হাজির হত।

তখনকার মানুষজনও ছিল অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং অতিথি বৎসল। তাই ভেদো বামুনের আবির্ভাবে নিজেদের ধন্য মনে করত তারা। এখনকার দিনের মতো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না তখন। বিনা নিমন্ত্রণেও কেউ এলে তাকে যথেষ্ট সমাদর করে খেতে বসতে বলত।

ভেদো বামুন একবার কার মুখে যেন খবর পেল ডসকরার বাবুদের বাড়ি বিরাট এক ভোজের আয়োজন হয়েছে। জমিদারবাবুর একমাত্র ছেলের বিয়ে, তাই সবার আমন্ত্রণ। যদিও গ্রামান্তর, তবুও ভেদো বামুন। ভর দুপুরে ছাতি মাথায় দিয়ে চলল বিয়েবাড়ির ভোজ খেতে।

সময়টা গ্রীষ্মকাল। তাই খাটো ধুতি পরে গায়ে জীর্ণ একটা ফতুয়া চড়িয়ে খালি পায়েই চলল সে ভোজ খেতে। অনেকদূর যাবার পর একটা ছায়াঘন পাকুড় গাছের নীচে বসল সে বিশ্রাম নিতে।

খানিক বিশ্রাম নেওয়ার পর মনে হল কে যেন

তার টাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ভেদো বামুন একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল। কিন্তু কিছুই সে বুঝতে পারল না। ভাবল নিশ্চয়ই কোনো বাতাসের প্রভাব অথবা কোনো কাঠবিড়ালির লেজের প্রভাবে এমনটা হয়েছে। তবে এদিক সেদিক তাকিয়ে সে কিছুই বুঝতে পারল না।

এরপর যখন উঠি উঠি করছে ঠিক তখনই তার মাথায় একটা চাঁটি। কে যেন বলল, 'এই ব্যাটা ভেদো, কোথায় যাচ্ছিস রে এই ভরদুপুরে ?'

ভেদো বামুন উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়েও কাউকেই দেখতে পেল না। তবে গলার আওয়াজটা খুব পরিচিত বলে মনে হল। কাউকেই দেখতে না পেয়ে ভেদো বামুনের গলার স্বর চড়ল, 'কে বটে রে ?'

অমনি উত্তর এল, 'আমি রে, আমি। আমি নেপো। একবার ওপরদিকে তাকিয়ে দেখ।'

নেপো ! মানে নেপাল ভট্চায। একই গ্রামের মানুষ দুজনে। বছর তিনেক আগে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। সে এখানে আসবে কী করে ? তবু ওপরদিকে তাকাতেই দেখতে পেল লম্বা চেহারার একটা কেলে ভূত বসে আছে গাছের ডালে। কিন্তু এ কী চেহারা তার ? আগের সঙ্গে তো মিলছে না। আগে কেমন গোলগাল নাদুস নুদুস চেহারা ছিল নেপোর। দুজনে একসঙ্গে লোকের বাড়ি কোনো অনুষ্ঠান হলে ভোজ খেতে যেত। তবে নেপোর একটা দোষ ছিল হাতের কাছে যেখানে যা পেত তাই নিয়েই সট্‌কে পড়ত। ছিঁচকে চোর যাকে বলে ঠিক তাই। কেউ ওকে দেখতে পারত না।

ভেদো বামুন বলল, 'তুই নেপোই হোস আর যেই হোস এখানে কী করছিস ?'

'কী আবার করব ? ভূত হয়ে গাছের হাওয়া খাচ্ছি। কিন্তু তুই এখন যাচ্ছিস কোথায় ? নিশ্চয়ই কোনো ভোজ বাড়ির গন্ধ পেয়েছিস ?'

'পেয়েছিই তো। সেজন্যই তো যাচ্ছি। এই আমি চললুম।' বলে চলা শুরু করতেই নেপো বলল, 'তবে আম্মো যাব তোর তোর সঙ্গে। অনেকদিন বিয়েবাড়ির ভোজ খাইনি। আজ দুজনে একসঙ্গে বসে খাব।'

ভেদো বামুন বলল, 'সাধ মন্দ নয়। তোকে আমি নিয়ে গেলে তো যাবি।'

নেপো অমনি গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে নেমে ভেদো বামুনের গলা জড়িয়ে ধরে তার পিঠে চেপে বসল।

ভেদো বামুন রেগে বলল, 'পিঠে চাপলি যে ? নাম বলছি। না হলে কষে দুটো থাপ্পর দেব।'

'দে না। ওতে আমার কিচ্ছু হবে না। কান মলে দে, ঝ্যাঁটার বাড়ি মার, মাথায় পেরেক গেঁথে দে। লাগবেই না আমার।'

ভেদো বামুন বলল, 'তোর ব্যবস্থা আমি করছি দাঁড়া।'

'কী ব্যবস্থা করবি ?'

'গয়ায় দিয়ে তোর নামে পিণ্ডি দিয়ে আসব।'

নেপো হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'তোর মতো বিটলে বামুনের হাতে পিণ্ডি আমি খেলে তো ? তুই যখন পিণ্ডি দিবি আমি তখন মুখে কচুপাতা চাপা দিয়ে বসে থাকব।'

এমন সময় ওরা দেখতে পেল আশেপাশেরই গ্রামের কয়েকজন লোক একটি মড়া নিয়ে কোথায় যেন পোড়াতে যাচ্ছে। তাই দেখে নেপো বলল, 'যা তবে তুই। আমি এখন ওই মড়ায় গিয়ে ভর করি। ওদের কাঁধে চেপে দোল খেতে খেতে যাই। কী আনন্দ। বেশ মজা হবে। তবে একটা কথা, তুই ব্যাটা কস্মিনকালেও গয়ায় যাবি না। আমিও চাই না তোর হাতে পিণ্ডি খেতে। নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার সময় আমার জন্য বরং ভালোমন্দ খাবার কিছু তোর ওই গামছায় বেঁধে নিয়ে আসবি।'

ভেদো বামুন বলল, 'ওসব আমার দ্বারা হবে না হে। তোর জন্য ভালোমন্দ কেন কিছুই আমাকে দেবে না কেউ।'

'আহা, ওরা দেবে কেন ? খেতে খেতেই যা পাবি টুকটাক করে গামছায় বেঁধে নিবি। আমি তো আমার গিন্নির জন্যে ওইভাবেই ভোজ বাড়ি থেকে খাবার বেঁধে আনতাম। অথচ সেই গিন্নিই একদিন আমাকে এমন ঝ্যাঁটাপেটা করলে যে মনের দুঃখে আমি এসে গলায় দড়ি দিলুম।'

ভেদো বামুন বলল, 'তুই হচ্ছিস ছ্যাঁচড়া বামুন তাই ওই সব বাজে কাজ করে এসেছিস সারাজীবন। আমি যা কখনও করিনি আজও তা করব না। কিছুই আনব না তোর জন্য।'

'বেশ তাহলে যা ভালো বুঝিস তাই কর। আমারও নাম নেপো। তুই যখন খেতে বসবি আমি তখন তোর ওপরই ভর করব। তারপর খাওয়া কাকে বলে দেখাব। কথায় বলে ভূতের খাওয়া। এমন খাওয়া খাব যে ওরা তোকে কান ধরে তুলে দিতে পথ পাবে না।'

ভেদো বামুন নিজের মনেই গজগজ করতে করতে এগিয়ে চলল ডসকরার দিকে। আর নেপো গিয়ে মড়ার খাটিয়ায় চেপে বসল।

সন্ধের আগেই ডসকরায় গিয়ে পৌঁছল ভেদো বামুন। সে কী এলাহি ব্যাপার সেখানে। জমিদারবাবুর একমাত্র ছেলের বিয়ে। সেদিন তার বউ ভাত। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে শয়ে শয়ে লোক এসেছে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। খাওয়া দাওয়ার তাই বিশাল আয়োজন। একটি বড়ো মাঠে চার পাঁচ জায়গায় রান্না হচ্ছে। না হলে সামাল দিতে পারবে কেন ?

মস্ত সামিয়ানার নীচে হ্যাজাকের আলোয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে চার পাঁচ জায়গায়। সন্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই জমিদারের লোকেরা এসে

অতিথিদের আহ্বান জানালেন, 'এবার আপনারা এক এক করে এসে আসন গ্রহণ করতে পারেন।'

অতিথিরা তাই আসনে বসে ভাঁড়ে দেওয়া জলে কলাপাতা ধুয়ে পরিবেশন হওয়ার অপেক্ষায় রইলেন। তখনকার দিনে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না। মাটিতে আসন পেতে বসেই খেতে হত। আর কোনো কাজের বাড়ির অনুষ্ঠানে মাংসের চল ছিল না। লুচি, ভাজা, ডাল, তরকারি ও অপর্যাপ্ত পুকুরের মাছই ছিল প্রধান পদ। এছাড়া বোঁদে, পানতুয়া, সন্দেশ, রসগোল্লা, দরবেশ ও দই ছিল মিষ্টিমুখের জন্য।

খাওয়ার ডাক পড়তেই ভেদো বামুনও আসনগ্রহণ করে বসে পড়ল এক পাশে। সে কী দারুণ ভোজ। দু'তিনশো লুচি, সাদা তরকারি, বড়ো বড়ো দু'তিন কড়া মাছ ভেদো বামুন একাই খেয়ে শেষ করল। এরপর মিষ্টি খাওয়া। দশ বারো সের বোঁদে, সাত আটশোর মতো পানতুয়া যখন নিমেষে খেয়ে ফেলল। তখন মহাভোজের আসরে দারুণ চঞ্চলতা দেখা দিল। সবাই নিজেদের খাওয়া ফেলে ভেদো বামুনের ভোজন বিলাস দেখতে লাগল লাগল বড়ো বড়ো চোখ করে।

খবর গেল জমিদারবাবুর কাছে। খবর শোনামাত্র হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জমিদারবাবু। শুধু জমিদারবাবু নন, নায়েব, দেওয়ান এবং সম্ভ্রান্ত অনেকেই এলেন। কেননা সবার মুখেই তখন ছড়িয়ে পড়েছে কোথা থেকে এক নররাক্ষসের আবির্ভাব হয়েছে এখানে।

জমিদারবাবু এসে করজোড়ে ভেদো বামুনকে বললেন, 'কে আপনি প্রভু ? কোথা থেকে এসেছেন ?

ভেদো বামুনকে তখন চিনতে পেরেছে দু'একজন। তাদেরই একজন বলল, 'এ তো ভেদিয়ার ভেদো। যেখানে যত কাজকর্মের বাড়ি হয় সেখানেই যায় ও। কিন্তু এমন খাওয়া এর আগে আর কখনও খেয়েছে বলে তো শুনিনি।'

অপর একজন বলল, 'আমার মনে হয় ভেদো বামুনের চেহারা নিয়েই কোনো প্রেত এসে খেতে বসেছে এখানে। এখনই কোনো ওঝা গুণিন ডেকে এর ব্যবস্থা করা উচিত।'

জমিদারবাবু বললেন, 'কী লজ্জার কথা। একজন ব্রাহ্মণ মানুষ। আজকের দিনে তাঁর আমি অসম্মান করি কী করে ? উনি আর কত খাবেন ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।'

জমিদারের গোমস্তা একজন প্রবীণ মানুষ। তিনি এসে ভেদো বামুনকে দেখে বললেন, 'সত্যি সত্যিই এই মানুষটা নিজে খাচ্ছেন না। ওঁর খাওয়া ভূতে খাচ্ছে। কেননা স্বাভাবিক মানুষের চোখমুখের ঘোর এমন হয় না।' বলে তিনি ভেদো বামুনের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'মহাশয়, শুনছেন ?'

ভেদো বামুন বললেন, 'শুনছি বৈকি।'

'আপনি কি ভেদিয়ার সেই ভেদো বামুন ?'

'আমি নেপো। ভোজবাড়িতে খেতে এসেছি। আমার পেট ভরানোর খ্যামতা তোমাদের কারও নেই।'

এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বললেন, 'আমার আছে রে হতচ্ছাড়া। তোর কী অবস্থা আমি করি এবার তুই দেখ।'

সবাই তাকিয়ে দেখলেন গুণিনের সেরা গুণিন শঙ্করী আচার্যি মড়ার মাথার খুলি, হাড় এবং আরও কী সব নিয়ে যেন রুদ্রমূর্তিতে হাজির হয়েছেন সেখানে।

আচার্যিকে দেখেই ভেদো বামুনকে ছেড়ে পালালো নেপো। ভেদো বামুনও তখন মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল।

অনেক পরে সকলের সেবা শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরল ভেদো বামুনের। সকলে জানতে চাইল, 'নেপো কে ? আর অমন অমানুষিক খাওয়া এই বয়সে তুমি খেলেই বা কী করে ?'

ভেদো বামুন তখন আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বলল। এও বলল, 'ওই নেপোর ভূত আমাকে ভর করায় আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। আমার মুখ দিয়ে যে খাবার আমি খেয়েছি তা ওই নেপোয় খেয়েছে।'

সে রাতে আর গ্রামে ফেরা হল না ভেদো বামুনের। পরদিন সকালে সামান্য কিছু প্রণামী ও এক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে জমিদারবাবু তাঁর দুজন লোকের সঙ্গে ঘুর পথে ভেদিয়ায় পাঠালেন ভেদো বামুনকে।

সেদিনের পর থেকে ভেদো বামুন আর কখনও কোনো কাজের বাড়িতে খেতে যায়নি।

অনুষ্ঠানের আগাম খবর



বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাও ? চাও কি তোমাদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানের খবর পেতে ? খেয়াল রাখো এই পাতায়।

- **১৬ই ডিসেম্বর ২০১২** 'কচি কাঁচা সবুজ সাথী' পত্রিকার আয়োজনে পশ্চিম পুটিয়ারি তরুণ দল ক্লাবে সকাল ৯টা থেকে অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। প্রবেশ মূল্য - ৫টাকা।

- **২১শে ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত** শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ছোটোদের ছবি দেখানো হবে। নন্দন ১, ২, ৩, ৪, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, উত্তম মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে ছবি, থাকবে আলোচনাচক্র ও কর্মশালা। এবারের বিশেষ বিষয় – ফেলুদা, কাকাবাবু লরেল-হার্ডি। শিশু কিশোর আকাডেমি থেকে চলচ্চিত্র উৎসবের ডেলিগেট ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা সংগ্রহ করতে পারে, শুধুমাত্র ২ কপি স্ট্যাম্পসাইজ ছবি লাগবে। ডেলিগেট কার্ড-এর মাধ্যমে সমস্ত পেক্ষাগৃহে সমস্ত শো দেখা যেতে পারে। উৎসবের সময় ছোটোদের পাশাপাশি বড়োরাও ফ্রি পাশ সংগ্রহ করতে পারে।

- **২২শে ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত** ৫ম রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব। মোহরকুঞ্জে (রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে অবস্থিত পার্ক-এ)। থাকবে ছোটোদের নাচ-গান-আবৃত্তি-ম্যাজিক-মূকাভিনয়-যন্ত্রবাদন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের একক ও দলগত পরিবেশনা।

- **২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত** রবীন্দ্রসদন পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য ও খ্যাতিমান শিল্পীদের আমন্ত্রিত অনুষ্ঠান।

- **৩১শে ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ৩রা জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত** শিশির মঞ্চে চলবে শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব। এই নাট্যোৎসবের নামকরণ করা হয়েছে সুকুমার রায়ের নামে। বিভিন্ন নাট্যদল ছোটোদের নাটকে অংশ নেবে।

সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য সকলের প্রবেশ অবাধ।

ছোটোদের জন্য আয়োজিত আপনাদের অনুষ্ঠানের আগাম খবর জানান আমাদের। আমরা নিখরচায় তা প্রকাশ করবো এই পাতায়।



রাজার ছুটি



অশোককুমার সেনগুপ্ত

ভারী ভালোমানুষ রাজামশাই। দিব্যি রাজত্ব করছিলেন। হঠাৎ যে কী হল, বলে বসলেন, 'মন্ত্রী সবাই তোমরা ছুটি পাও। আমি কেন পাব না?' মন্ত্রী বললেন, 'তা ঠিক। তা ঠিক।' রাজা মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা, 'আমার ছুটি চাই।' কিন্তু ছুটি চাই বললেই তো হয় না। প্রধান সমস্যা, রাজামশাই কার কাছে দরখাস্ত করবেন। তিনিই তো সবার দরখাস্তে সই করে ছুটি মঞ্জুর করেন। তাঁর দরখাস্তে কে সই করবে। মহা ভাবনা। ভার পড়ল রাজসভার মহাপণ্ডিতের উপর। তিনি টাক চুলকে, বিস্তর বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, তিন টিপ নস্যি পরপর টেনে বললেন, 'আছে। উপায় আছে।' রাজামশাই খেঁকিয়ে ওঠেন, 'বাতলাঁন। জলদি বাতলান।' মহাপণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, আপনি হলেন শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম। মানে ওইটি আপনার নাম। আপনি দরখাস্ত লিখুন ওই নাম দিয়ে। তারপর মহারাজ হিসেবে দরখাস্ত মঞ্জুর করুন। তবে মহারাজ কখনও কিন্তু শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রী শ্রী গঙ্গারাম লিখবেন না। মানে ওই মঞ্জুরের সিগনেচারটা আর কী! স্রেফ মহারাজ।'

রাজামশাইয়ের আনন্দ দেখে কে। ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। রানিকে বলতেই রানি বললেন, 'ব্যাস, এবার খাও দাও ঘুমোও।' রাজামশাই বললেন, সে কী। ছুটিতে বেড়াতে যাব দুটিতে। রানি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি বেড়াতে যাব। বল কী! আরে তাহলে তো আমাকে পাঁচ সখী, কাজের পঁয়ত্রিশ। তারসঙ্গে আছে অন্তত আরো পনের। সবাইকে নিয়ে যেতে হয়। না বাবু, আমার যাওয়া হবে না। এখন যাও তো। আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে ফেসিয়াল করতে হবে।' রাজামশাই বললেন, 'ফেসিয়াল কোনো নতুন খাবার বুঝি।' রানি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ফেস শুনেই তুমি খাবার কথা ভেবেছো।' ফেসিয়াল হচ্ছে মুখের পরিচর্যা।' রাজার কপালে হাত। আরে মুখের পরিচর্যা মানেই তো খাওয়া। তবে সে কথা বললেন না।

তা কী আর করা যায়। বেরিয়ে পড়লেন রাজামশাই। উঁহু, রাজামশাই নয়, বেরিয়ে পড়ল গঙ্গারাম। এখন আর রাজা কোথায়! একটা খাটো ধুতি, তার উপর শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। এসব অবশ্য মন্ত্রীমশাই জোগাড় করে দিয়েছেন।

রাস্তায় বেরিয়ে গঙ্গারামের কী স্ফূর্তি। একেই বলে ছুটি। আহা দিনের রং কী ঝলমলে। ঝকঝকে আকাশ, সবুজপাতার ঝালর নিয়ে কত রকমের গাছ, রাস্তায় কত লোক যাচ্ছে, কত দোকান পাট। কী আনন্দ! গঙ্গারাম হেঁটে চলল। রাজধানী শহর ছাড়িয়ে একটা ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল সরু লতায় ক্ষেত ভর্তি। তার মধ্যে বিরাট বিরাট ফল। কী আশ্চর্য! না দেখলে, বিশ্বাস হত না। গঙ্গারাম একটা লোকও দেখতে পেল ক্ষেতের সামনে। মোটাসোটা কালো শরীর, খাটোধুতির

উপর গামছা বাঁধা, গায়ে কিছু নেই, একমাথা চুল, খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

'ও ভাই এগুলো কী ফল ?' গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করে।

'ফল ! এ যে দেখি হাঁদা গঙ্গারাম।'

'তুমি আমার নাম জানো দেখছি।'

লোকটা বলল, 'তোমার নাম বুঝি হাঁদা গঙ্গারাম।'

'না, হাঁদাটা নয়। শুধু গঙ্গারাম।'

'ঠিক আছে, হাঁদাটা না হয় যোগ করে নিও। আর শোন, এগুলো কুমড়ো। একে ফসল বলতে পার। ফলের মাঝে একটা দন্ত্যস দিতে হবে।'

'বুঝেছি। কুমড়োর ছক্কা অমি খেয়েছি।'

'বাব্বা, ঘ্যাঁট নয়। একেবারে ছক্কা !' গঙ্গারাম বলল, 'শোন, আমার কিন্তু খাওয়ার কথা মনে পড়ায় খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিতে পার ?'

'কেন পারব না। তবে ওই দেখ, কুমড়ো ডাঁই করা আছে। আমার ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর কাল হাটে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে আমি পৌঁছে দেব।'

লোকটা একলা চাষ করে। দেখল, এরকম হাঁদা গঙ্গারাম যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন একে দিয়ে দিব্যি কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। তবে একদিনেই বুঝল, এ খুব পরিশ্রমী নয়। তা হোক। মনে হচ্চে, এ সব কাজ অভ্যেস নেই। হয়ে যাবে ধীরে ধীরে।

লোকটার বউও বলল, 'ভারী ভালো লোক। একটু বোকা সোকা। বলে কী না, পোলাও কালিয়া খেত নাকি ! কে যে দিত। যাক্ গে, রেখে দাও ওকে। মুখে বললেও যা দি, দিব্যি খেয়ে নেয়।'

গঙ্গারাম লোকটাকে বলল একদিন, 'আচ্ছা, তুমি ছুটি পাও না ?'

'ছুটি। সে আবার কী !'

'আরে আরাম। কাজ কর্ম্ম করবে না। বসে থাকবে।'

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলল, 'বসে থাকব ! তাহলে তো চাষের ক্ষতি। খাব কী ! না, না, ওসব ছুটিফুটি জানি না। তবে হ্যাঁ, শরীর খারাপ হলে, জ্বরজ্বালা হলে বসে থাকতে হয়। সে ভারী কষ্ট।'

গঙ্গারাম কথা বাড়াল না।

বিকেলবেলায় নদীর ধারে গিয়ে গঙ্গারামের এক জেলের সঙ্গে আলাপ। গঙ্গারাম মাছ চেয়েছিল। তারপর ওর বাড়িতে জাল বয়ে দিয়ে এসে একটা মাছ ও পেয়েছে। সেই থেকে ভাব। তাকেও একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি ছুটি পাওনা ?'

ছুটির নাম শুনে জেলের মুখ হাঁ। তার ছুটি। বলল, 'আরে ভাই, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন কাজ। মরলে ছুটি। তবে মরতে কে চায় ! আমার ছুটির দরকার নেই। দিব্যি আছি।'

গঙ্গারাম বলল, 'তাই তো দেখছি।'

জেলে বলল, 'ওই যে কাঠের কাজ করছে, ওরও ছুটি নেই।'

'আর ওই মিষ্টির দোকানদার ?'

'উঁহু। ওরও ছুটি নেই। তা অমন ছুটি নিয়ে পড়লে কেন ?'

গঙ্গারাম বলল, 'তাই ভাবছি।'

'তা তুমি ভাবতে পার। তোমার তো এখানে ওখানে করে খাওয়া। ওই চাষী লোকটাও ভালো। তুমি ছুটির কথা ভাবতেই পার।'

এই ছুটির ভাবনা থেকেই গঙ্গারামের মনে হল, আরে সে তো ছুটিতে দিব্যি আছে। কিন্তু রাজ্য কেমন চলছে ?

চাষী লোকটাকেও জিজ্ঞাসাকরতে সে বলল, কী জানি ভাই। কে খবর রাখে !'

জেলেকে জিজ্ঞাসা করতে তারও একই উত্তর।

মিষ্টির দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতে তারও একই উত্তর।

এরপর কাঠের মিস্ত্রি, মাটি কাটা মজুর, নৌকা চালানো মাঝি তাদেরও একই উত্তর।

গঙ্গারামের মাথায় এখন রাজামশাই জেগে উঠছে। ভাবলেন, থাক্, ঢের হয়েছে। আর ছুটি নয়। এবার ফেরা দরকার। গিয়েই প্রথম কাজ ছুটি বন্ধ।

ফিরতেই রাজপ্রাসাদের কেউ চিনতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রী চিনলেন। বললেন, 'তাহলে ফিরে এলেন !'

হ্যাঁ। রাজত্ব তো ভালোই চলছে।

চলছে ভালোই। আমরা মন্ত্রীরা সব কাজকর্ম ভাগ করে নিয়েছি।

রাজামশাই বললেন, 'আর ভাগের দরকার নেই। আমি এসে পড়েছি।'

মন্ত্রী বললে, 'তা পড়েছেন। কিন্তু মন্ত্রীসভায় এ নিয়ে আলোচনা দরকার।'

মন্ত্রী সভায় বৈঠক বসল। বিস্তর তর্ক বিতর্ক। আইনমন্ত্রী রাজার দরখাস্তটা নিয়ে পড়ে বললেন, 'আপনি ছুটি নিয়েছেন। নির্দিষ্ট করা সেই কতদিন। ছুটি মানে অনন্তকাল। আপনার ছুটি তো ফুরবে না। স্বয়ং মহারাজ এ দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে গঙ্গারামবাবু।'

রাজামশাই তখন মহাপণ্ডিতকে চেপে ধরলেন, 'একী মহাপণ্ডিত, আপনি এ কী হচ্ছি দিয়েছিলেন। দরখাস্ত আপনিই লিখেছেন। এখন আপনিই উপায় বাতলান।'

মহাপণ্ডিত টাক চুলকে তিন টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। উপায় আছে। উপায় আছে।'

'জলদি বলুন। জলদি বলুন।'

মহাপণ্ডিত বললেন, 'মন্ত্রীসভায় প্রস্তাব নেওয়া হোক, যেমন এখন চলছে, তেমন চলবে। রাজামশাই সিংহাসনে বসে থাকবেন। তিনি ছুটিতেই থাকবেন। কোনো মন্ত্রীরই ক্ষমতা খর্ব হবে না। এদিকে মহারাজেরও থাকার সুরাহা হয়ে গেল।'

মন্ত্রীসভা সমস্বরে বলল, 'সাধু। সাধু।' প্রস্তাব পাস হল।

তারপর রাজামশাই সিংহাসনে বসে থাকেন। আর ভাবেন, ছুটি বন্ধ করার মতলব নিয়ে এসেছিলেন। এদিকে তিনিই ছুটির ফাঁদে পড়ে গেলেন। কী দুঃখ !

ও প্রজাপতি রে



বিজন মজুমদার

একদিন হঠাৎ করে একটা প্রজাপতি ঢুকে পড়ল আমাদের ঘরে। দরজা খোলা ছিল– তাই হয়তো পথ ভুল করে সে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু পথ ভুলের কারণ কি ? আমাদের ঘর তো আর ফুলের বাগান নয় যে বাগানে ফোটা ফুলের আকর্ষণে সে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে। তবে এটাও ঠিক, ঘরের দেয়ালে অনেক ফুলের ছবি শোভা পাচ্ছে। জানি না বাবা, ছবির ফুলের টানে প্রজাপতি এমন কাণ্ড করল কী না ! আচ্ছা, ছবির ফুলের আবার গন্ধ থাকে না কি ? এ সব হাজার চিন্তা ও সম্ভবনা আমাকে অস্থির করে তুলল। আচ্ছা, প্রজাপতি ঢুকেছে তো ঢুকেছে, এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় ?

হয়, মানে হয় বই কী ? তোমরাই বল, কী গরমটাই না গেল এবার। লোডশেডিং হলে বুঝি গরম কাকে বলে ? এখন, প্রজাপতি তো আর ঘরে ঢুকে শান্ত হয়ে বসে নেই ! একবার এ দেয়ালে একবার ও দেয়ালে গিয়ে বসছে। মোট কথা, চড়কি বাজির মতো পাক খাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে ! কখনো কখনো দেয়ালে গিয়ে ধাক্কাও খাচ্ছে। রাতকানা না কি রে বাবা, এদিকে গরমে ঘামছি। ফানটা যে চালাব– উপায় নেই। মানে ? মানে আর কি ! ফ্যান চালাই আর প্রজাপতি ফ্যানের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ইহলোক সাঙ্গ করুক আর কি ! হোক না প্রজাপতি– তা বলে ওকে অবহেলা করব, প্রাণটা কেড়ে নেব, এতটা নীরস ও প্রাণহীন আমি নই। ! প্রজাপতির মতো সুন্দর আর কে আছে বল ?

তা প্রজাপতি যখন ঢুকেই পড়েছে ঘরে, ইচ্ছে হল, কয়েকটা ছবি তুলে রাখি। ক্যামেরা ছিল হাতের কাছেই। কিন্তু ছবি তুলি কার সাধ্যি ? ব্যাটা যে একটু চুপ করে দেয়ালে বসছেই না ! খালি ডানা ঝাঁপটাচ্ছে আর উড়ছে ! একটু শান্ত হয়ে বোস না বাবা ! একটু ছবি তুলতে দে না ভাই ! কে, শোনে কার কথা ! দেয়ালে দেয়ালে গুঁতো খাবে– তবু একটু স্থির হয়ে বসবে না ! মানে হয় ?

কী আর মানে হবে ! মানেই যদি থাকত, তাহলে কি প্রজাপতি ফুলের বাগান ছেড়ে আমাদের ঘরে আসে ? আচ্ছা, এমন নয়তো, গরমে কাবু হয়েই প্রজাপতি আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল একটু ফ্যানের হাওয়া খেতে ?

কিন্তু ফ্যান যে ওর যম, এ বুদ্ধি কি ওর আছে ? ওই প্রজাপতির জন্যই আমরা ঘরে বসে দরদর করে ঘামছি ! ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিলাম

যাতে ও সহজে বাইরে যেতে পারে। কিন্তু যা বুঝলাম– ও একটি হাঁদারাম ! বাইরে বেরোনোর এত পথ, একটা পথও সে খুঁজে পাচ্ছে না ? দেয়ালে গুঁতো খাচ্ছে, তবু বেরোতে পারছে না ! আচ্ছা, ওর কোনো গোপন উদ্দেশ্য নেই তো ? না, মানে, ও কোনো ছদ্মবেশি ড্রাকুলা নয়তো ? ও ! ভাবতেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে ! ধুত্তুর ! আমিও যেমন বোকারাম ! একটা প্রজাপতিই তো, তাকে নিয়ে ভেবে ভেবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি কলসি কলসি। একে তো গরম, ঘাম, প্রজাপতির ঘাম– এযে ঘামে ঘামে বেঘোরে মারা যাব।

আচ্ছা, কী করে ওকে বাইরে পাঠানো যায় ? একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম– ও বারবার আলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। এ ঘটনা আমার চোখ খুলে দিল। আমি করলাম কী– হঠাৎ করে আলোটা নিভিয়ে দিলাম পাঁচ দশ মিনিটের জন্য। তারপর আবার আলো জ্বেলে দেখি– প্রজাপতি ভ্যানিশ ! অবাক কাণ্ড, ব্যাটা প্রজাপতি, তুমি আলোতে দেয়ালে গুঁতো খাও, আর অন্ধকারে দিব্যি ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পার। অন্ধকারে তুমি যে ভালো দেখ– এটা তো জানতাম না। তা বাবা প্রজাপতি, গেছ, ভালো করেছ। এখন ফ্যানটা একটু চালাই ! আলোটা একটু জ্বালাই। ওরে প্রজাপতি, জ্বালাতে আর আসিস না রে ভাই !!

লেখকদের প্রতি

- ছোটোদের উপযোগী যে কোনো লেখা সাদরে বরণীয়
- লেখা হতে হবে মৌলিক, একবার প্রকাশিত লেখা (তা হাতে লেখা পত্রিকা হলেও) পাঠানো নিষিদ্ধ
- লেখার সঙ্গে লেখকের সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই। যদি থাকে, ফোন নম্বর উল্লেখ থাকলে ভালো হয়
- লেখা মনোনীত হলে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে
- কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে তা পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব মূহূর্তে লেখককে জানিয়ে দেওয়া হবে
- প্রকাশিত হলে লেখক সৌজন্য সংখ্যা পাবেন
- লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্ক্যাপ কাগজে, দুদিকে মার্জিন ছেড়ে ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে
- লেখার মধ্যে গৃহিত তথ্য, উদ্ধৃতি অথবা অন্য কোনো লেখার ছায়া থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে
- লেখা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত
- প্রয়োজনে লেখা পরিমার্জনের অধিকার সম্পাদকমণ্ডলীর থাকবে। এজন্য লেখককে প্রস্তুত থাকতে হবে
- লেখা কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা কোনোভাবেই ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়

আমরা চাই নিজে লেখা পাঠান
নতুন লেখক বন্ধুদের লেখা পাঠাতে অনুরোধ করুন
আর ছোটোদের লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন

বিশেষ ঘোষণা

ছোটোদের জন্য যা ভালো,
যা কিছু ভালো

চিরকালের ছেলেবেলা
আছে তার সঙ্গেই

ছোটোদের অনুষ্ঠানের যেমন– আবৃত্তি, বসে আঁকো, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, গল্প-ছড়া রচনা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা কিংবা অনুষ্ঠানের **আগাম খবর জানান** আমাদের
আমরা তা প্রকাশ করব নিখরচায়
আমাদের পত্রিকার পাতায়।

আমাদের চেষ্টা প্রত্যেক সংখ্যায়
আগের সংখ্যা-কে ছাপিয়ে যাওয়ার
এজন্য চাই লেখক, পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের মূল্যবান পরামর্শ।

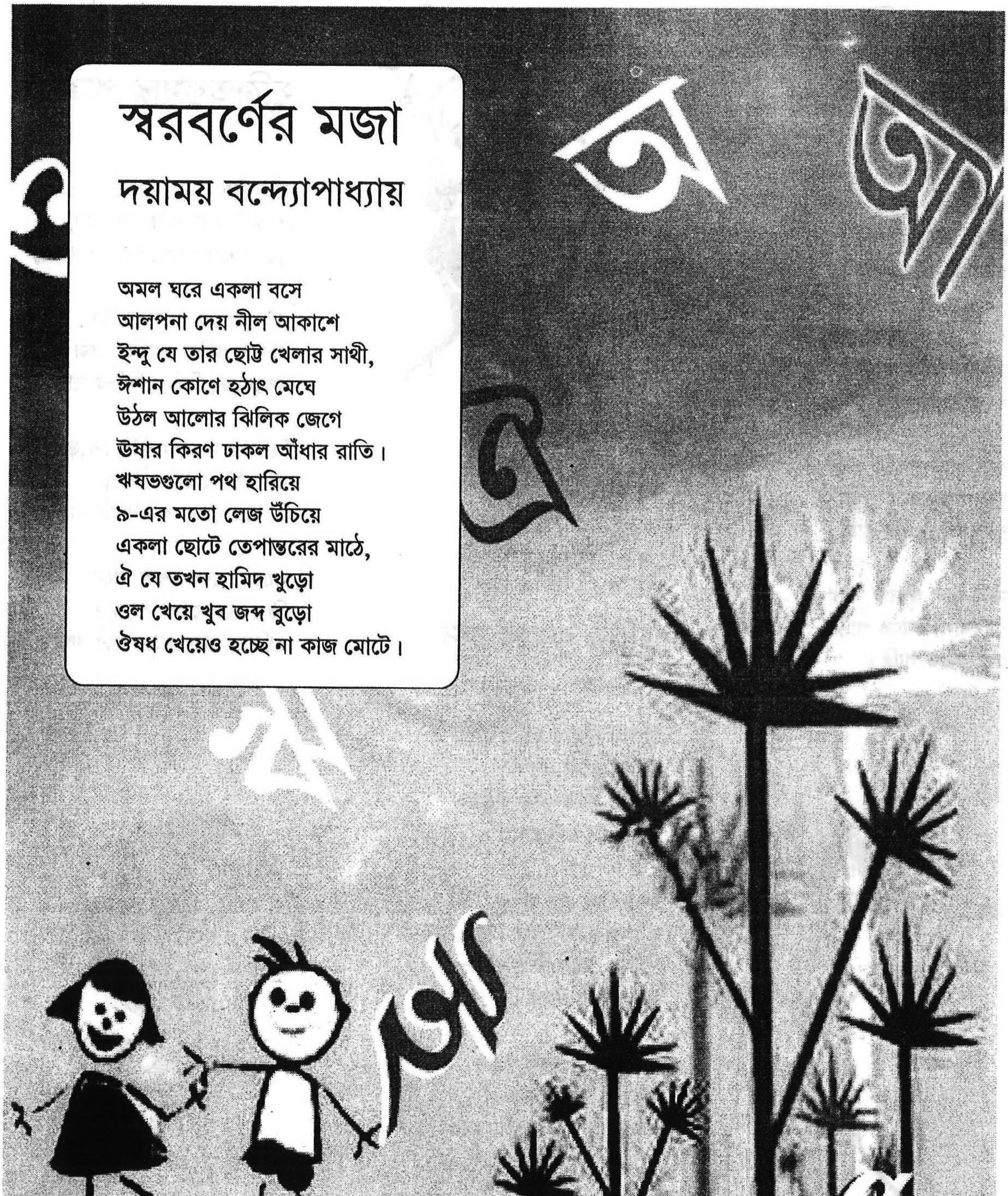
পরামর্শ পাঠান এই ঠিকানায় :

সম্পাদক : 'চিরকালের ছেলেবেলা'
'প্রাণ বাগিচা', সোদপুর রবীন্দ্র নগর,
ডাক্তার বাগান, কলকাতা – ৭০০ ০৮২

স্বরবর্ণের মজা

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অমল ঘরে একলা বসে
আলপনা দেয় নীল আকাশে
ইন্দু যে তার ছোট্ট খেলার সাথী,
ঈশান কোণে হঠাৎ মেঘে
উঠল আলোর ঝিলিক জেগে
ঊষার কিরণ ঢাকল আঁধার রাতি।
ঋষভগুলো পথ হারিয়ে
৯-এর মতো লেজ উঁচিয়ে
একলা ছোটে তেপান্তরের মাঠে,
ঐ যে তখন হামিদ খুড়ো
ওল খেয়ে খুব জব্দ বুড়ো
ঔষধ খেয়েও হচ্ছে না কাজ মোটে।



পারদর্শী

সুভাষ সুন্দর মুখোপাধ্যায়

আমি গান গাইতে পারি
বৃষ্টিতে নাইতে পারি
নদীবুকে বাইতে পারি,

আমি ছবি আঁকতে পারি
রোদ্‌দুর মাখতে পারি
সবকাজে থাকতে পারি,

আমি পড়া পড়তে পারি
প্রজাপতি ধরতে পারি
ফুলমালা গড়তে পারি,

আমি কথা শুনতে পারি
পাখিবাসা গুনতে পারি
স্বপ্ন বুনতে পারি।





ধব ধবে রং সাদা

তুহিন কুমার চন্দ

হাঁপের ব্যথায় ফনির বাবা
যেদিন হলো পাগল।
সেদিন নাকি কুন্তি বুড়ির
গাছ খেল এক ছাগল।

কালো রং-এর ছাগল সেটা
দুধ নাকি সে খেয়ে।
পাটনা থেকে দিল্লি গেল–
রামপ্রসাদী গেয়ে।

ফনির বাবা যতই তাকে
ঘাস খাওয়াতে যায়।
ততই ছাগল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে-
রামপ্রসাদী গায়।

তারপরেতে গাইল ছাগল-
সারে-গামা-পাধা।
অবাক কাণ্ড দুধ খেয়ে তার
ধব ধবে রং সাদা।

ছেলেবেলা

সুজিতকুমার পাত্র

বুদ্ধি ভীষণ কম, পিউটার
শেখেনি আজও কম্পিউটার,
পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে,

এই যুগেতে অচল সে যে
থাকবে কদিন বোকা সেজে
বললে শুধু মিচিক মিচিক হাসে।

পিউ বলে, তোর বুদ্ধি বেড়ে
কম্পিউটার নেড়ে চেড়ে
জি. কে টাকে কর না ভীষণ পাকা,

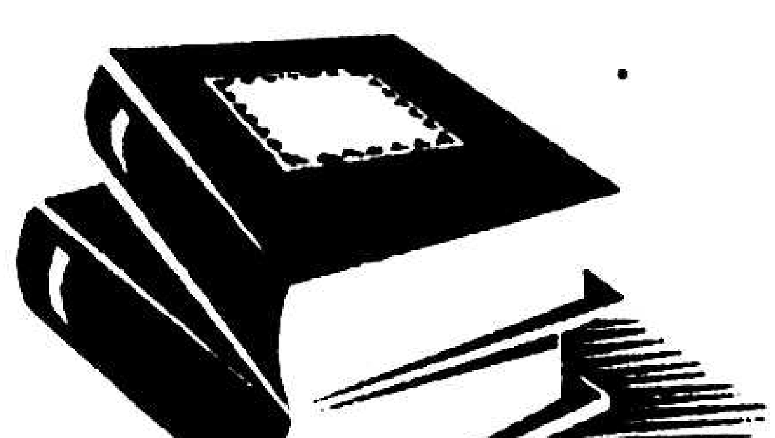
ওতো পরেও শেখা যাবে
কিন্তু ছেলেবেলা পাবে ?
হারিয়ে গেলে যাবে ধরে রাখা !



জগন্নাথের খেয়াল-খাতা

জগন্নাথ পণ্ডিত লিখিত ও জিতেন্দ্রমোহন বসু বিচিত্রিত। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৬২

বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মণি-মাণিক্য। যা পেলে তোমরা চমকে উঠবে, খুশিতে মনটাও উঠবে ভরে। বুঝতে পারবে আমাদের বাংলা সাহিত্য কত সমৃদ্ধ। তোমাদের সেই চাহিদার কথা মনে রেখে 'চিরকালের ছেলেবেলা'র প্রতি সংখ্যায় তেমনই একটি করে বইয়ের হদিশ দিচ্ছেন **অনির্বাণ রায়**



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছি। পড়েছি তাঁর লেখা বর্ণপরিচয় প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগ। কই, জগন্নাথ পণ্ডিতের নাম শুনিনি তো।

আমিও শুনেছি নাকি। এই শুনছি। জানছি, এ হল ছদ্মনাম। আসল নাম কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১ – ১৯৬৫)। তাঁর বাবাকে দেশের মানুষ একডাকে চেনে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী আর মর্ডান রিভিউ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বিশেষ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের।

তা এই জগন্নাথ পণ্ডিতের নটি গল্প নিয়ে এই 'খেয়াল খাতা'। কেন লেখা হয়েছিল, কীভাবে, শুনে নিই গল্পকারের নিজের মুখে 'বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন নিজেই ছিলাম বালক, খেলাধূলা ও গল্প শোনায় ছিল সমানে উৎসাহ। আমরা ছিলাম তখন এলাহবাদে, পিতার কর্মস্থলে। খেলার সাথীর মধ্যে হিন্দুস্থানীই ছিল বেশি, আর গল্প শোনাবার লোকের মধ্যে ছিল একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, বাবার আরদালী। সে যৌবনে ফৌজি সিপাহী ছিল এবং সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানীর বিরুদ্ধদলে যোগ দেয়। আর ছিল বাবার বেয়ারা হিন্দুস্থানী কাহার। সে কৈশোরের কুলীর আড়কাটির পাল্লায় পড়ে ট্রিনিডাড যায়।

খেয়াল-খাতার গল্প ঠিক তাদের বলা গল্প নয়, তবে তাদের জীবনের কাহিনীর ছায়া এগুলির কয়েকটিতেই আছে।'

প্রথম গল্প 'ঢ্যাংএর ফলার'। এটি লেখা হয়েছিল সুকুমার রায়ের 'অনুরোধে'। (এ বছর সুকুমার রায়ের জন্মের একশো পঁচিশ বছর হল।) গল্প কিন্তু ছড়ায় লেখা। মিল দিয়ে।

কিন্তু, কে এই ঢ্যাং। অনেকটা ড্রাগনের মতো। মস্ত ল্যাজ। মাথায় শিং। মুখের উপরে গণ্ডারের মতো আরো একটা। এমনভাবে চেয়ে আছে যে বুক হিম হয়ে যায়। তা এই ঢ্যাং খায় বাঘ। বাঘ না হলে তার চলে না। এদিকে বনে হয়েছে বাঘের আকাল। পেট চলা দায়। কী করা যায়। ব্রাহ্মণের মতো সাজ করে ঢ্যাং চলল শহরবাগে। যেতে যেতে, যেতে যেতে তারা – বলা হয়নি, ঢ্যাং-এর সঙ্গে চলেছে তার গিন্নী ঢেঙ্গী, কিবা অপরূপ তাকে দেখতে– রাজবাড়িতে হাজির। রাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। চলছে বিপুল ভোজ। ঢ্যাং-ঢেঙ্গী সেখানে হাজির হতে কী হল সেই গল্প বেশ জম্পেশ করে ছন্দমিল দিয়ে বলা হয়েছে। আসলে ওরা ছিল পেটুক। খেতে ভালোবাসত। কী কী খেয়েছিল– অবশ্য খেয়ে মন ওঠেনি–তার কথা জানিয়ে দিয়েছেন জগন্নাথ পণ্ডিত। গণ্ডারের কাটলেট। হাতির কলিজা। কুমিরের সর্ষেগোলা। তিমি মাছ ভাজা। কচি বাঘের নিরামিষ ঝোল। এইসব খেয়েও তাদের মন ভরেনি। এঁটো হাতে চলে যাওয়ার সময় তারা বলে যায় :

"একি খায় ভদ্রলোকে ? মুখে মার ঝাঁটা।"
"মানুষ ব্যাটারা জন্তু !"

আর গল্পের শেষে, জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রশ্ন :

হে ভাই সন্দেশ যদি তোমার বাড়িতে
ঢ্যাং আসে, খেতে বল কি কি দেবে পাতে।

তা, সন্দেশকে জিজ্ঞসা কেন। আসলে এই গল্পটা বেরিয়েছিল সন্দেশ পত্রিকায় ১৩২০ সালে। প্রায় একশো বছর আগে। বাকি আটটা গল্প ছোটো করে শোনাতে গেলে বেশ অনেকটা জায়গা লাগবে। তাই গল্পগুলোর নাম কেবল জানিয়ে রাখি। ভবম হাজাম। শাহ চুকন্দর। দেবতার কৌশল। হাতী রমজান। বব্বরখেরে বন্দুক। হকীমী চাল। হকীম হুড়ুকবাজ। ভৌতিক ব্যাপার।

ছোটোরা পারলে বইটা সংগ্রহ করে একবার পড়ো। ভালো লাগবে।


কাহিনী ও কমিক্স
বারিদ বরণ চৌধুরী
হ্যাবলাদা
বৎস তোমাদের হ্যাবলাদা কই ? তার দর্শন পেতে সুদূর হিমালয় থেকে এসেছি। উনি ভগবান ! সমাজের সব অসুরদের নিধন করছেন।
হ্যাবলাদার এত খ্যাতি ? আপনাকে দেখতেও অনেকটা হ্যালাদার মতো।
হেঃ হেঃ কেমম জব্দ করলাম রে গোবদা প্যাংলা !
ছিনতাইবাজ
থেকে সাবধান
বুঝেছি তুমি ঐ ছিনতাইবাজটাকে ধরার জন্য এই মেকাপ নিয়েছ।
অন্যদিকে
আমার জিনিস ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে ! ধরো ! ধরো !
অন্যসাধু
আমার বাক্সটা জমা রইল। পরে এসে নিয়ে যাব।
কি বিপদ !
কি ঝামেলায় পড়লাম রে বাবা ! শান্তিতে একটু ধ্যান করতে দেবে না দেখছি। সুটকেসটা কি তোমার ?
হ্যাঁ প্রভু !



পরে হ্যাবলাদাকে
সাধুবাবা কোথায় যাচ্ছ, আমার সুটকেসটা !
সুটকেস ? বৎস, তুমি ভুল করেছ, আমি বাবা হ্যাবলানাথ !
তুমি হ্যাবলানাথ কি ক্যাবলানাথ যাই হও আমার সুটকেস ফেরত দাও।
কি সংকটে ফেললে বৎস !
সাধুবাবা, আপনাকে কি কুকুরে ধাওয়া করেছে ?
বলছি সব বলছি বৎস ! কুকুরের থেকেও সর্বনেশে জীব।
পরিকল্পনা মাফিক
তুমি কি সাধুবাবাকে খুঁজছ ? ঐ যে বসে।
সাধুকে খুঁজছি তুই জানলি কি করে ?
সাধু সেজে পুলিশ
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি !
এ যেন জয় বাবা ফেলুনাথ ছবির মগনলাল বধ !
গেছি রে ! পুলিশ !
হ্যাবলাদা তোমাকে সাধু সাজলে বেশ লাগে। জয় বাবা হ্যাবলানাথ !
হ্যাবলা তোমার জন্য ছিনতাই বাজটাকে ধরতে পেরেছি। অনেকদিন হল জ্বালাচ্ছিল। তোমাকে উপহার হিসাবে এই ফুল দিলাম।
ফুল না দিয়ে ফুলকপি আনলে বেশি খুশি হতাম।





জয়ন্ত ভট্টাচার্য

নোবেল পুরস্কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে আলফ্রেড নোবেলের জন্ম। সারাজীবনে নোবেল ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৩০০-র মতো জিনিস আবিষ্কার করেন যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ডিনামাইট (Dynamite) নামক এক প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক। এই ডিনামাইটের স্বত্ব বা Patent Righto বিক্রি করে নোবেল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮৮৮ সালে ভাই লুডভিগের মৃত্যু হলে এক ফরাসী সংবাদপত্র ভুলবশত আলফ্রেড-এর মৃত্যু সংবাদ ছাপায় এবং তাঁকে 'মৃত্যুর বণিক' বা 'Merchant of Death' বলে উল্লেখ করে। এই সংবাদ পাঠ করে আলফ্রেড ভীষণ ব্যথিত হন এবং মনে মনে ঠিক করেন যে এমন কিছু করতে হবে যাতে মানুষ তাঁকে চিরকাল স্মরণ করে। সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই এই পুরস্কারের সূচনা।

১৯০১ সাল থেকে পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ পাদর্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্ব, সাহিত্য এবং শান্তি-র ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে 'Sveriges Riksbank' তাদের ৩০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নোবেল ফাউন্ডেশন-কে এক বিপুল অর্থ দান করে ; সেই সঙ্গে নোবেলের সম্মানার্থে এক পুরস্কার চালু করে। পরের বছর প্রথমবার 'Nobel Memorial Prize in Economic Sciences' বা অর্থনীতিতে নোবেল প্রদান করা হয়। যদিও সরকারী ভাবে এটি নোবেল পুরস্কার নয়, তবে এই পুরস্কার ঘোষণা ও প্রদান একই সাথে করা হয়।

এসো এবার নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে তোমরা কতটা কী জানো, নিজেরাই পরীক্ষা করে নাও।

১) নোবেল কমিটি প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর তারিখে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। এই তারিখের গুরুত্ব কী ?

২) মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে, ২৭/১১/১৮৯৫ তারিখে আলফ্রেড নোবেল তার শেষ উইলে পুরস্কারের পরিকল্পনা করেন এবং পুরস্কারের অর্থ হিসেবে নিজের সম্পত্তি এক অংশ দান করেন। সেই অংশটি কত ?

৩) যে ডিনামাইট নামক বিস্ফোরকটি অবিষ্কার করে নোবেল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন, সেটি তিনি কোন্ সালে আবিষ্কার করেন ?

৪) নোবেল শান্তি পুরস্কার-এর সঙ্গে বাকী চারটি পুরস্কারের কোথায় অমিল ?

৫) নোবেল পুরস্কারগুলি পৃথক-পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে। কোন্ প্রতিষ্ঠান কোন্ পুরস্কার প্রদান করে ?

৬) পুরস্কার স্বরূপ একজন নোবেল বিজেতা কী রূপে ভূষিত হন ?

৭) নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি পুরস্কার সর্বাধিক কত জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে ?

৮) নোবেল ফাউন্ডেশন কবে স্থাপিত হয় ?

৯) নোবেল পুরস্কার কী মরণোত্তর দেওয়া সম্ভব ?

১০) ১৯৪৮ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার কাকে প্রদান করা হয় ?

গত সংখ্যার উত্তর : ১। দেবী কালী ২। পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী ও কালরাত্রি ৩। রম্ভা, কুচ, হরিদ্রা (হলুদ), বিল্ব (বেল), মানকচু, অশোক, জয়ন্তী, ধান্য ও দাড়িম্ব ৪। দেবী চামুণ্ডা ৫। তিনবার ৬। ১৯৩২ সালে ৭। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র



পিঁপড়ের মিছিল

অতসী চক্রবর্তী

ও বাড়িতে রাখা আছে রসগোল্লার হাঁড়ি। যাবি ? .... খাবি ? যাই চল তাড়াতাড়ি গিয়ে সব সাবার করি। বন পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে ওইখানে সেই বাড়ি। খবর এনেছে রাজামশাই। আয় লাইন দিই। আজ আর ইস্কুল নেই। রসগোল্লার খোঁজ, তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ি সবাই। মিলবে না রোজ রোজ, ল্যাণ্ডাব্যাণ্ডা, যে যেখানে আছে। এই বলে রাজার পিছু নিল পিঁপড়ের দল। রাজা পিঁপড়ে লালা ফেলতে ফেলতে পথ করে এসেছিল। সেইপথে ঝিঁ ঝিঁ পাড়ার পিঁপড়ে পরিবার। জোনাকী পাড়ার পিঁপড়ে পরিবার, গুবরে পাড়ার, মশক পাড়ার, এরকম বিভিন্ন পাড়ার থেকে চলে এল শয়ে শয়ে পিঁপড়ে পরিবার। এত বড়ো হাজার লাইনের সারি সঠিকভাবে পরিচালনা করে সেন বাড়ির রসগোল্লার হাঁড়ি অবধি পৌঁছানো কি চাট্টিখানি কথা ? রাজা পিঁপড়ের হুকুম 'পেরোতে হবে অনেক পথ। মিনিটখানেক চলার পরে আগডুম-বাগডুমের জঙ্গল। পেরোতেই হবে, করছি শপথ। জঙ্গল পেরোলে পড়বে গুপ্তিপাড়ার মাঠ, বেঁধে নাও আঁটঘাট। মাঠের শেষপ্রান্তে জল্লাদ সেনের বাড়ি। চলো যাই ঘন্টাখানেকের যাত্রা তাড়াতাড়ি। জল্লাদ সেনের আসল নাম জওহরলাল সেন। সেন বাড়ির কর্তা। আচার ব্যবহারে সকলে ওকে জল্লাদ সেন বলেই ডাকে। অবশ্য সামনে নয় আড়ালে আবডালে। বাড়িতে কাকপক্ষী বসার জো নেই। একবার জবা গাছের পাতা খেয়েছিল বলে আস্ত একটা ছাগলের ল্যাজ কেটে দিয়েছিল। এ হেন জল্লাদ সেন, থুড়ি জওহরলাল সেনের বাড়ীতে দুর্গাপুজোর পর দূর দুরান্ত থেকে মেয়ে-জামাই, আত্মীয়-স্বজন বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন। সবার হাতেই একটা করে রসগোল্লার হাঁড়ি, বাড়িটা একেবারে রসোময়। সেন বাড়ির হেসেলে সেন বউ, তিন ছেলের বউ, মেয়ে। আর বাচ্চা-কাচ্চা মিলে বাড়িটা গম্‌গম্‌ করছে। সেন বাড়ির রিমঝিম। ক্লাস থ্রি। আর ছোটো নাতনি ঝিলমিল। ক্লাস ওয়ান। বড়ো নাতি বাপ্পা ক্লাস সিক্স। ভারি দুষ্টু। সুযোগ পেলেই বোন দুটোকে চুল টেনে দৌড়য়। লুডু খেলায় হেরে গেলেই গুটিগুলো সব এলোমেলো করে দেবে। আর রিমঝিম ? পড়াশুনোয় একদম মন নেই। পড়তে ব'সে রান্নাঘর থেকে চুরি করে আনা চিনির দানা সামনের জানলা থেকে পড়ার টেবিল পর্যন্ত লাইন দিয়ে সাজায় আর একটু পরেই লাইন দিয়ে চলে আসে সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল। ততক্ষণে ঝিলমিলের পড়া শেষ। দিদির দুষ্টুমি দেখে বলে, দাঁড়া এক্ষুনি

বম্মাকে গিয়ে বলছি।

– না না বলিস না। কখনো দেখেছিস পিঁপড়েরা কী সুন্দর লাইন দিয়ে খেতে আসে। লাইন করে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় ! এই সব গল্প বলে থামিয়ে দেয়।

বাপ্পা মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে বড়োরা দেবার পরেও ওকে চুরি করে খেতে হয়। অন্ধকারে রান্নাঘরে ঢুকে রসগোল্লা খেতে গিয়ে তো উল্টে পড়েই গেল ও, হাড়িটাও উল্টোলো। রসে এতক্ষণে স্লাবের ওপরটা যে কী অবস্থা হয়েছে কে জানে ! কাল সকালেই পিঁপড়েরা লাইন দেবে। দাদু জানলে যে কী করবে ?

সেবার দাদুর বইয়ের পিছনের র‍্যাকে নেংটি ইঁদুরগুলো কাগজ কুঁচিয়ে ফুলঝুরির মতো বাসা বানিয়ে ছিল। তাতে কী সুন্দর গোলাপী রং -এর ছোটো ছোটো বাচ্চা। বাপ্পা, ঝিম্‌ঝিম্, ঝিলমিল রোজ দেখত ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো একটু একটু করে নড়ছে। রিমঝিম তো কেঁদেই ফেলল, যখন দেখল সব বাচ্চাগুলোকে রাস্তার ধারে ফেলে দিল।

কাল সকালে যে কী অবস্থা হবে ! এক গাদা পিঁপড়েতে রান্নাঘর ভরে যাবে। কই পাশেই মিত্রির বাড়িতে তো এরকম হয় না। অনায়াসে ছাগল ঢুকে পড়ছে, কেউ তো তাড়ায় না ! সকাল ৬টায় মিত্তির ঠাকুমা গম-মুড়ি ছড়িয়ে পায়রাদের ডাকে। বিল্টুদের বাড়ী পায়রাগুলোও ওবাড়িতে এসে গম খেয়ে যায়, বক্‌বকম করে করে ভোরের ঘুম ভাঙায়। দুপুরবেলা ভুলো, লালু তিন চারটে নেড়ি কুকুর খেতে আসে, আর বেড়ালগুলোর তো সবসময় যাতায়াত। ইঁদুর, কাক কী নেই ওদের বাড়ী ? শালিকদুটোও তো রান্নাঘরের জানলা থেকে খাবার নিয়ে যায়। মিত্তির দাদু-সবাইকে কত ভালোবাসে। কাউকে কিচ্ছু বলে না। সে পশু হোক, প্রাণী হোক আর মানুষই।

ওদিকে রসগোল্লার রস জানলা দিয়ে গড়িয়ে নদীর মতো নামছে মাটিতে। বাপ্পা রাতে ঘুমোতে পারে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ। কি জানি রসগোল্লাগুলো ছিটকে ছিটকে যে কোনটা কোথায় পড়েছে !

কি এত বিড়বিড় করছিস রে ? সারাদিন খেলবি, আবার রাত্রে সেগুলো আওড়াবি। এখন ঘুমো। বলল বাপ্পার মা। সেন বাড়ী বড়ো বউ।

ওদিকে পিঁপড়ের মিছিল এগিয়ে চলেছে। গুপ্তিপাড়ারমাঠে। বড়ো গোল মাথাওয়ালা ডেউ পিঁপড়ে ঘাড় নেড়ে বলে 'আর মাত্র কয়েকমিনিটে পৌঁছাব সেনবাড়ী। তোমার সারিবদ্ধভাবে ঢুকে ছড়িয়ে পড়বে রান্না ঘরে। তবেই পাবে রস। কেউ হৈ-হুল্লা করবে না। রসের ভিতর গড়িয়ে গেলে, আসবে না কেউ কাউকে ফেলে। কথাটা প্রতিটি পিঁপড়ে মুখে মুখে চালান করে দেয় লাইনের শেষ পিঁপড়ে পর্যন্ত। এভাবেই তারা এগিয়ে চলে সেনবাড়ীর দিকে। এর মাঝে কত বাধা, কাঠ পিঁপড়ে, ডাশ পিঁপড়ে, গাছ পিঁপড়ে সবাই সুধোয় 'যাচ্ছিস কোন চুলোয় ? কোন বাড়ীতে মিছিল ? রাজা বলে - 'বলব না, বলব না। মুখে দিয়েছি খিল',– এই বলে পিঁপড়ের দল কালো কালো মাথা কোমর দুলিয়ে এগিয়ে চলে। পথে ভ্রমর, মৌমাছি বলে 'করছিস ভুল, ফিরতে পারবি না। আমাদের সঙ্গে নে, বিপদ বুঝলে ফুটিয়ে দেব হুল। সেন বাড়ির জল্লাদ। মশা মাছি পিঁপড়েকে করে না রেয়াত।' সে কথায় কর্ণপাত করে না রাজা পিঁপড়ে। ক্রমগতিতে এগিয়ে চলে পিঁপড়ের মিছিল। অবশেষে সেনবাড়ির রান্নাঘরের জানলা বেয়ে লাইন দিয়ে ওপরে উঠে হেঁসেলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে পিঁপড়ের দল।একজন আরেকজনের পিঠের ওপর উঠে রসগোল্লা খাচ্ছে। বুড়ো ও শিশু পিঁপড়েরা গড়িয়ে পড়া রসে একেবারে মশগুল। এতক্ষণে বড়ো বউ রান্নাঘরের দরজা খুলে ফেলেছে। 'এ-কী, এ অবস্থা করল কে ? ইস্ পা-টা একেবারে চ্যাটচ্যাট করছে।' বলতে না বলতেই রাজা দিল কুটুস করে কামড়ে। অমনি চিৎকার। ছুটে আসে সবাই। মেজো, ছোটো, মেয়ে, জামাই ...এ-কী, একী অবস্থা ? সারা রান্নাঘর কালো থিকথিক করছে। সবাই বেশ বুঝতে পারে কালো বলগুলো আসলে এক একটা রসগোল্লা। চ্যাঁচামেচি শুনে চোখ রগরাতে রগরাতে উঠে আসে বাপ্পা, রিমঝিম, ঝিলমিল। অবশেষে জওহরলাল সেন। 'কে করল এ অবস্থা ?' সেন গিন্নী বলল, 'নিশ্চয়ই মিত্তির বাড়ীর বেড়ালগুলো। বেড়াল, কুকুর নিয়ে যা আদিখ্যেতা ওদের।' ঝিলমিল বলল, 'কিন্তু ঢুকবে কোথা দিয়ে ?' জল্লাদ সেন আর এক মুহূর্ত দেরী না করে, চটি, পেপার, লাঠি দিয়ে পিঁপড়ে নিধন আরম্ভ করল। বাপ্পার গলা শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু আপাতত পিঁপড়ে নিয়ে সবার মাথাব্যথা। ওদিকে মিত্তির ঠাকুমা গম ছিটোচ্ছে। বক্‌বকম করে করে পায়রারা খাচ্ছে। রিমঝিমের মনটা একটু খারাপ। মুখে ব্রাশ নিয়ে আনমনে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দেখছে মরে যাওয়া পিঁপড়েগুলোকে। অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে – এক বিরাট পিঁপড়ের মিছিল মরা পিঁপড়েগুলোকে মুখে করে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কে জানে ? ওর চোখে জল সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। এদিকে রাজাকে অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে চলেছে। বড়ো ডেউ পিঁপড়েটা মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে –

"যাবার সময় ভেবেছিলাম,হবে মহাভোজ

এমন খাবার কি আর ভাই,মেলে রোজ রোজ।

সেন বাড়ীর সে জল্লাদটা, করল দুশো জবাই

বাঁচার জন্য এমনি করেই,করতে লড়াই।"

এক গল্প বলিয়ের গল্প



ভাস্কর ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ। সে সময় ইউরোপের সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের কাছে ক্রীতদাস রাখা ছিল একটা শখের ব্যাপার। এদের কাছে ক্রীতদাসেরা থাকত বাড়ির আর পাঁচটা পোষা জন্তু জানোয়ারের মতোই। কাজের একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই, হলেই পিঠে পড়ত চাবুক– পিঠ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলেও ক্রীতদাসকে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হত। তাকে যে পয়সার বিনিময়ে কেনা হয়েছে– একথা মুহূর্তের জন্যেও তাদের মনিবরা তাদের ভুলতে দিতেন না। তবে সবাই যে একই রকমের নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনিব হতেন, তা কিন্তু নয়, দু-একজন আবার খুব ভালোও হতেন। আর সেই সব ভালো মনিবদের কৃপায়, দয়ায় কখনো কখনো এই সব ক্রীতদাসেরা মুক্তিও পেয়ে যেত।

এই ইউরোপেরই এক বিখ্যাত দেশ গ্রীস আর সেই গ্রীসেরই একটা ছোট্ট দ্বীপ সামোস। এই সামোস দ্বীপেই বাস করেন মিঃ জ্যানমাস আর মিঃ ইয়াদমন। দুজনেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তাই ক্রীতদাস রাখা তাদের মতে খুবই স্বাভাবিক। মিঃ জ্যানমাসের ঘরে থাকে একজন ক্রীতদাস। বয়স অল্প, দেখতে খুবই কুৎসিত, দেহও বিকলাঙ্গ উপরন্তু কথাও বলে তুতলিয়ে। কিন্তু এত দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তার বুদ্ধি ছিল প্রখর আর বিচারশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তার একটা গুণও ছিল। জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পারত সে। কিন্তু যে বাড়িতে সে থাকত সেই বাড়ির মনিবের কাছে তার এই সমস্ত গুণের কোনো কদরই ছিল না। সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমটাই না করতে হত তাকে। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন কোথাও বসত তখন তার মনটাও ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। আর যে ভালো লাগে না এই পরিবেশ। কিন্তু উপায় যে নেই– মনিব না ছাড়লে সে ছেড়ে যাবেই বা কি করে। সমস্ত মনপ্রাণ বিষিয়ে ওঠে, বিদ্রোহী হয়ে

ওঠে– একসময় ভাবে কোথাও পালিয়ে যাবে। কিন্তু তাতেই বা মুক্তি কোথায় ? যদি ধরা পড়ে যায়– সে যে ভয়ঙ্কর শাস্তি। সে শাস্তির কথা মনে হলেই আবার মনে মনে শিউরে ওঠে তরুণ ক্রীতদাসটি। কখনো ক্রীতদাসটি বসে বসে ভাবে, কতজনের কাছেই তো শোনা যায় কত দয়াবান মনিবের কথা। এরকম কোনো দয়াবান মনিব যদি তার কপালে জুটত– তাহলে হয়তো সে তার গুণের কদর পেত। কারণ সে তো জানে যে তার গল্প শুনতে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা কি পছন্দই না করে। সে শুধু ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না।

হঠাৎই একদিন এসে গেল সুযোগ। ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। তার মনিব মিঃ জ্যানমাস তার কাজে একটুও সুন্তুষ্ট ছিলেন না– তাই বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে বিক্রী করে দিলেন ঐ দ্বীপেরই আরেকজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বাসিন্দা– মিঃ ইয়াদমনের কাছে।

ইয়াদমন মানুষ হিসেবে ছিলেন ভীষণ ভালো। তিনি ক্রীতদাসটার কাজে খুবই খুশী হলেন। আর শুধু খুশীই হলেন না ; লেখাপড়ার ইচ্ছে আছে দেখে তার লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থাও করে দিলেন। এযে সুবর্ণসুযোগ। তরুণ ক্রীতদাসটি আনন্দে আত্মহারা। সে তো ভাবতেই পারেনি যে কোনোদিন এমন সুযোগ তার জীবনে কখনো আসতে পারে। সে জানে সে আসলে ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের কোনো সখ-সৌখিনতা থাকতে নেই, ওসব তাঁদের জন্য নয়। তবু তার জীবনে এমন সুযোগ যখন এল, একি কেউ হাতছাড়া করে ? তাই একটুও সময় নষ্ট না করে পড়াশুনোর কাজে লেগে গেল সে। আগেই বলেছি, ক্রীতদাসটির বিচার বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাই খুব তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে ফেলল সে। আর সেই সঙ্গে একটা ভীষণ ভালো কাজও পেয়ে গেল। প্রতিদিন বিকেলে কাজের শেষে পথের ধারে বসে ঐ দ্বীপেরই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের গল্প শোনানো। আর এই গল্প-এর ব্যাপারে চিরকালই সে খুব পটু। ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনা, পশুপাখী জন্তুজানোয়ারদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে চমৎকার জমিয়ে গল্প বলত সে। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার গল্প শোনার জন্য ছেলেমেয়েদের ভীড় বাড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে তার নামও ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। সকলেই তার গল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এদিকে তরুণ ক্রীতদাসটির জীবনে ঘটে গেল আরও একটি ঘটনা। তার মনিব কিছুদিনের জন্য ব্যবসার প্রয়োজনে একটা দূরের দেশে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন কিছু খাবার-দাবার, ব্যবসার কাজে লাগে এমন কিছু জিনিসপত্র আর সেই সঙ্গে নিলেন ব্যবহার যোগ্য বিছানা, জামাকাপড় ইত্যাদি। মনিবের সঙ্গে যাচ্ছে আরো কয়েকজন ক্রীতদাস। মোট হয়েছে বেশ কয়েকটা। তার মধ্যে একটা মোট আবার সব থেকে ভারী, কারণ ওটাতেই রয়েছে বেশ কয়েকদিনের খাবার-দাবার। ভারী দেখে কোনো ক্রীতদাসই ওটার দিকে গেল না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তরুণ ক্রীতদাসটি কোনো কথা না বলে ঐ ভারী বোঝাটাই তুলে নিল মাথায়। অন্যান্য ক্রীতদাসেরা আড়ালে তার এই বোকামী দেখে হাসাহাসি শুরু করল।

যাইহোক, যাত্রা শুরু হল। সমস্ত ক্রীতদাসের মাথাতেই বোঝা। সকলেই বোঝা মাথায় হেঁটে চলেছে। তরুণ ক্রীতদাসটি বোঝার ভারে যতই পিছিয়ে পড়তে লাগল, অন্যান্য ক্রীতদাসেরা ততই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তরুণ ক্রীতদাসটি কিন্তু তাদের এই ঠাট্টা বিদ্রুপের উত্তরে কিছুই বলল না– নীরবে বোঝা মাথায় নিয়ে হেঁটে চলল। আসল ব্যাপারটা কিন্তু ধরা পড়ল কদিন বাদেই। তরুণটির কাছে ছিল খাবারের বোঝা যতদিন যেতে লাগল খাবার খাওয়া হতে হতে বোঝাও ততই হালকা হতে থাকল। ফলে পথ চলার পরিশ্রমে যখন অনেকের বোঝাগুলি হয়ে উঠেছে আরও ভারী তখন তরুণটির বোঝা অনেক হালকা। পথ চলায় বা বোঝা বইতে তখন আর কোনো অসুবিধাই নেই। এতদিন অন্যান্য যে সমস্ত ক্রীতদাসেরা তাকে বোকা মনে করে ঠাট্টা-রসিকতা করত, এবার তারা নীরবে ভারী বোঝা বইবার চালাকিটা ধরে ফেলে নিজেরাই বোকা বনে গেছে।

মনিব কিন্তু তার এই উপস্থিত বুদ্ধি দেখে খুবই খুশী হলেন। আরো খুশী হলেন ফিরে এসে যখন তার গল্প বলার প্রশংসার কথা তাঁর কানে গেল।

ইয়াদমন মানুষ তো খুবই ভালো। তিনি সত্যিকারের গুণীকে সম্মান দিতে জানেন। একদিন তিনি তরুণ ক্রীতদাসকে ডাকলেন নিজের কাছে। জানালেন তাকে তাঁর খুশীর কথা। আশীর্বাদ করলেন প্রাণ ভরে আর সেই দিন তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন চিরকালের জন্য। বললেন– আমি চাই তুমি আরও বড়ো হয়ে ওঠো।

ক্রীতদাসটা কোনো কথা বলতে পারল না। তার দুটো চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে– মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর মুক্তির আনন্দে।

এটা যে সময়ের ঘটনা, সেই সময় কোনো ক্রীতদাস দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে খুব সম্মানের সঙ্গে ফিরে আসতে পারত। তরুণটিও তাই সমাজ জীবনে ফিরে আসা নিয়ে কোনো কথা ছিল না। সে মুক্তি পেয়েই ফিরে এল তার পুরোনো স্বাভাবিক জীবনে। ফিরে এসে তার প্রথম কাজ হল নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাড়িয়ে তোলা। সেজন্য সে আর দেরী না করে

বেরিয়ে পড়ল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে। এইভাবে নানা দেশে ঘুরতে ঘুরতে কত মানুষের সঙ্গে হল তার পরিচয়, নানা রকমের জীবন দেখতে পেল সে। এর ফলে তার লাভও হল খুব- বেড়ে উঠল তার জ্ঞান ভাণ্ডার।

এমনি করে দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতেই একসময় সে হাজির হল লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস-এ। লিডিয়ারাজ ক্রীসাস তার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। এই জ্ঞানলাভে উৎসাহী রাজার অনুরোধ সে কিছুতেই ঠেলতে পারল না- তাই শেষ পর্যন্ত সার্ডিসেরই বাসিন্দা হয়ে গেল সে।

শুধু যে বাস করতে লাগল- তাই নয়, রাজার কাজেও লেগে গেল সে। রাজা নানা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আসতেন তাঁর কাছে। আর যে তবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মবিচার করবার ক্ষমতা দিয়ে সে সমস্ত সমস্যার সামাধানের পথ বাতলে দিত। এইভাবে কখনও গল্প বলে, কখনও নানা কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করে তার দিনগুলি খুব সুন্দর কেটে যাচ্ছিল। আর এইসাথে দিনে দিনে সুনামও হচ্ছিলও রাজ্যজোড়া। একবার তো শুধুমাত্র গল্প বলেই জনতার সঙ্গে শাসকদলের বিরোধ মিটিয়ে দিল সে, ফলে সেখানেও পেল ভূয়সী প্রশংসা। এই কাহিনিটিরই পরে কাব্যরূপ দেন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি সক্রেটিস।

দিন যায় এইভাবেই, নানা খ্যাতির মধ্যে যুবক ক্রমে প্রৌঢ় হয় আর গল্প বলায় হয়ে ওঠে এক খ্যাতিমান পুরুষ।

এতক্ষণ যাঁর জীবনের কাহিনি তোমাদের শোনালাম, তিনি কে জানো? তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন গ্রীক সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কিংবদন্তীর নায়ক ঈশপ (Aesop)। ঈশপের গল্প পড়েনি, বাংলাদেশে এমন ছেলেমেয়ে প্রায় নেই বললেই চলে। যেমন গ্রীক সাহিত্যে তাঁর স্থান জ্যোতিষ্কের মতোই উজ্জ্বল, তেমনি সারা পৃথিবীর ছেলেমেদের কাছেও তিনি অমর হয়ে আছেন।

এইরকম একজন মানুষ অথচ তাঁর জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় না। যেটুকু জানা গেছে তার প্রায় সবকিছুই নানা কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে। একজন ঐতিহাসিক, নাম হেরোডোটাস, তিনি বলেন ঈশপের জন্ম ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ ভাগে। এরকম আরো নানামত, নানা কথা তাঁর জীবন সম্পর্কে আজও চলে আসছে। শুধু জীবনই বা কেন তাঁর মৃত্যু, মৃত্যু নিয়েও কি কম মতভেদ, কত মনীষী কত জনের মতই না প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, রাজা ক্রীসাস তাঁকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিয়ে ডেলকাই অঞ্চলে পাঠান সেখানকার সাধারণ লোকের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন সেখানকার লোকেরা ভীষণ লোভী। দেখে তিনি খুবই দুঃখ পান, তাই তাদের কিছু না দিয়ে ধনসম্পত্তি তিনি আবার রাজাকে ফিরিয়ে দেন। এতে ডেলকাই-এর লোকেরা ঈশপের উপর ভয়ঙ্কয় রেগে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অ্যাপেলো দেবতার মন্দির থেকে স্বর্ণপাত্র চুরির অভিযোগ আনে- বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আর সেই আদেশের ভিত্তিতেই তাঁকে একটি পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নীচে ফেলে তাঁকে হত্যা করা হয়।

গ্রীস দেশের ভ্রান্তি বিশ্বাস, ঈশপ নাকি মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভ করেন আর থার্মোপাইলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঈশপের মৃত্যুর প্রায় দুশো বছর পরে এথেন্সের বিখ্যাত ভাস্কর লাইসিপ্পাস (Lysippus) তাঁর একটি মূর্তি খোদাই করেন এবং সেই মূর্তিটিকে ক্রীসাসের সভার সন্ত-মনীষীর মূর্তির সামনে রাখা হয়। তবে সেই মূর্তি দেখে কিন্তু বোঝা যায় না যে ঈশপের চেহারায় কোনো বিকৃতি ছিল।

● ফিক করে

বাকিরা বসে থাকে

সুকুমার মণ্ডল

মা : ক্লাশে মাস্টারমশাই-এর কথা মন দিয়ে শুনতে বলেছিলাম, সে কথা মনে আছে তো ?

ছেলে : কিন্তু মা, মাস্টারমশাই অনেক কিছু জানেন না মনে হয়।

মা : তা কি করে হয়, তোমার এমন ধারণা কেন এল ?

ছেলে : বারে, উনি কেবল সবার কাছে বানান আর মানে জিজ্ঞেস করেন যে।

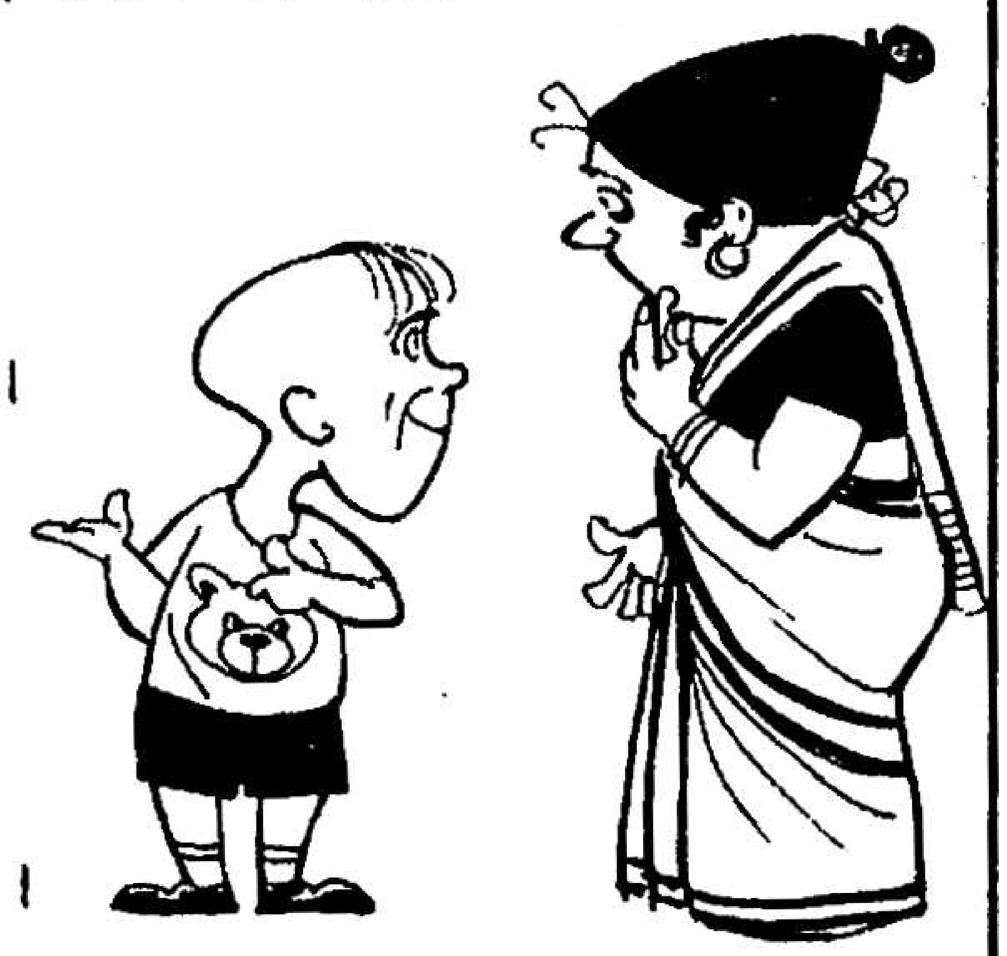
●

বাবা : নতুন স্কুল কেমন লাগছে ?

ছেলে : ক্লাশে আমি শুধু পরিশ্রম করি। বাকী সব কটা কুঁড়ে।

বাবা : সেটা কিভাবে বুঝলে ?

ছেলে : রোজদিন আমি একা সারা ক্লাশ বেঞ্চে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি আর বাকিরা বসে থাকে।



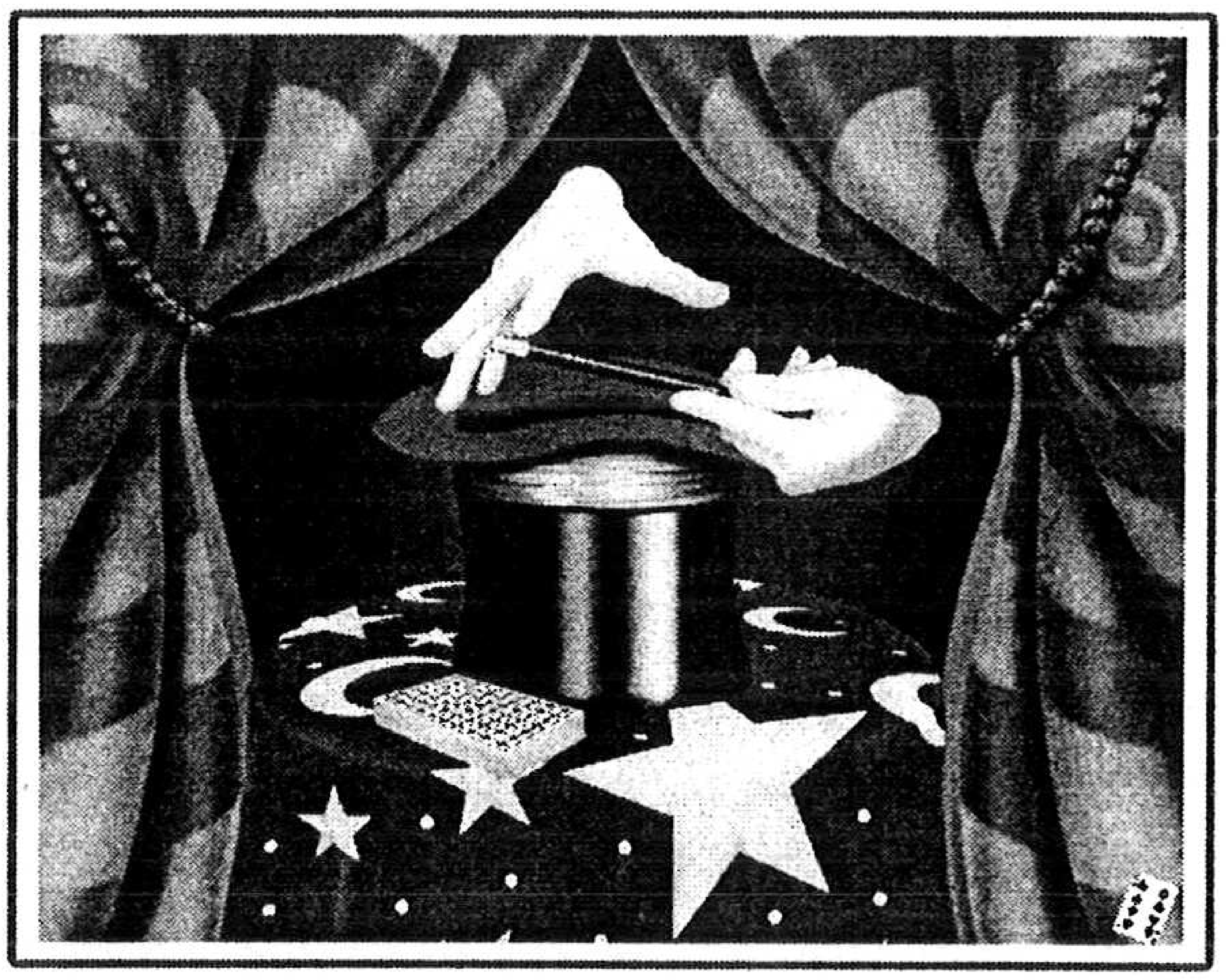
ভা-নু-ম-তী-কা-খে-ল

এই খেলার জন্য ৫টা সাদা ভিজিটিং কার্ড নাও। কার্ডগুলোর এক পিঠে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ৫টি ঘন বৃত্ত আঁকো। মনে করা যাক তুমি আঁকলে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বাদামি রঙের বৃত্ত। 'ভানুমতীকা খেল' কথাটা মনে রাখো।

খেলাটা দেখাবার সময় ৫টা কার্ড আলাদা আলাদা ভাবে টেবিলে রাখো, রঙীন বৃত্ত আঁকা পিঠগুলি উপরের দিকে থাকবে। বন্ধুদের বল, তুমি একটা মনের ম্যাজিক দেখাবে।

অতঃপর বন্ধুদের মধ্যে একজনকে বল সে তার পছন্দ মতো কার্ডগুলো এক এক করে তোমার হাতে একটা একটা করে রাখতে বন্ধু যখন এই কাজটা করছে তখন দেখে রাখো সে কোন কার্ডটা দ্বিতীয় কার্ড হিসাবে তোমার হাতে রাখল। মনে করা যাক সে নীল রঙের বৃত্ত আঁকা কার্ডটা দ্বিতীয় কার্ড হিসাবে তোমার হাতে রাখল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুমি নীল মনে রাখো। খেয়াল রাখবে বন্ধু যেন কার্ডগুলোর রঙীন বৃত্ত আঁকা পিঠগুলো উপরের দিকে করে, একটা প্যাকেট হিসাবে তোমার হাতে রাখে। এরপর প্যাকেটটা উপুড় করে টেবিলে রাখো। অর্থাৎ কার্ডগুলোর সাদা পিঠ এখন উপরের দিকে থাকবে। ফলে নীল রঙের বৃত্ত আঁকা কার্ডটি এখন উপুড় করা প্যাকেটে ওপর থেকে দ্বিতীয় কার্ড হিসাবে থাকবে– এটা খুব জরুরী।

এবার এক টুকরো সাদা কাগজ আর কলম নাও। বন্ধুকে বল সে যেন কার্ডে আঁকা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বাদামি রঙের বৃত্তগুলো মনে মনে ভাবে। বন্ধু যখন আপাততঃ দৃষ্টিতে এই কাজটা করছে, তখন তুমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে বল, তার চোখেতে তুমি একটা রঙীন বৃত্তের হালকা ছবি দেখছ ! এই রঙের নামটা তুমি এখন কাগজে লিখে রাখবে ভাবিষ্যৎ বাণী হিসাবে, যা তুমি পরে দেখাবে। অতঃপর কাগজের টুকরোটায় লেখ 'নীল', কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখো, কলমটাও সরিয়ে রাখো।



জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার কার্ডগুলোর প্যাকেটটা বন্ধুর হাতে দাও, সেটা উপুড় করা অবস্থায় আছে। তাকে বল, এখন তুমি, জোরে জোরে আর ছেড়ে ছেড়ে বলবে 'ভানুমতী কা খেল' আর তার সাথে সাথে তাকে এই কাজটা করতে হবে–

জোরে জোরে বল– 'ভা', আর বন্ধুকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা টেবিলে ফেলে দিতে। বন্ধু এটা করার পর জোরে বল 'নু' তাকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা প্যাকেটের তলায় চালান করতে। সে এটি করলে জোরে বল 'ম' এবং বন্ধুকে প্যাকেটের উপরের কার্ডটি টেবিলে ফেলে দিতে বল। এইভাবে 'তী' বল আর বন্ধুকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা প্যাকেটের তলায় চালান করতে। এরপর বল 'কা' আর তাকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা টেবিলে ফেলে দিতে। তারপরে বল 'খে', বন্ধুকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা প্যাকেটের তলায় চালান করতে। বন্ধুর হাতে এখন খালি ২টো কার্ড থাকবে।

এবার বল 'ল'। বন্ধুকে বল প্যাকেটের উপরের কার্ডটা টেবিলে ফেলে দিতে। সে এটা করার পর তাকে বল তার হাতে ধরা শেষ কার্ডটা সকলকে দেখাতে, তোমাকেও। সবাই দেখবে বন্ধুর হাতে রয়ে গেছে নীল রঙের বৃত্ত আঁকা কার্ডটা। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে সকলকে দেখিয়ে দাও যে তুমি আগে থেকেই কাগজে লিখে রেখেছ 'নীল'। হেসে বল এই হল তোমার মনের ম্যাজিক।

দুই ভাইয়ের কাণ্ড



সুব্রত সুন্দর জানা

খেলার ছলে ছুটতে ছুটতে রেল লাইনের পাশে পৌঁছে গেল দুই ভাই পাপ্পু আর বিশ্ব। কিছুটা দূরে রেল গাড়িটা যেন দৈত্যের মতো ছুটে আসছে। বিশ্ব ভয় পেয়ে বলল– দাদা, কী জোর শব্দ রে ! চল পালিয়ে যাই। ঠিক তখনই পাপ্পুর চোখে পড়ল সামনেই কিছুটা রেল পাত ভেঙে আছে। সে শুনেছে, রেলপাত ভাঙা থাকলে রেল গাড়ি উল্টে অ্যাকসিডেন্ট হয়। কি করবে ভাবতে গিয়ে চট করে বুদ্ধিটাও খেলে গেল মাথায়। ভাইকে বলল– দেখবি গাড়িটা কেমন থেমে যাবে।

বিশ্ব অবাক হয়ে বলল– এত বড়ো গাড়ি কি করে থামবে রে দাদা ?

– ঠিক থামবে, এখন ঝটপট তোর প্যান্টটা খুলে ফেল।

– আমি প্যান্ট খুললেই গাড়ি থামবে।

– আঃ বকর বকর করিস নাতো। যা বলি তাড়াতাড়ি কর। গাড়ি এসে গেল বলে।

বিশ্বর পরনে ছিল লাল প্যান্ট। আর পাপ্পুর ছিল লাল জামা। দুজনে দুটো খুলে হাতে নিয়ে ওড়াতে লাগল। গাড়িটা তাদের প্রায় কাছে এসে সত্যি সত্যি থেমে গেল। সেই দেখে তারা লাগাল ছুট, সোজা বাড়ির দিকে।

গাড়ির মধ্যে তখন হৈ চৈ, কী হল ব্যাপারটা। ট্রেন স্টেশনে ঢুকতে তখনও বাকি। ড্রাইভার নেমে গেছে গাড়ি থেকে। দেখা গেল কিছুটা দূরে প্রায় এক ফুটের মতো রেল পাত ভাঙা। আগের গাড়িটা যাওয়ার সময় লাইনটা ভেঙেছে। তাতে সেই গাড়িটা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু পরের গাড়ির সামনের চাকা গিয়ে যখন ঐ ভাঙার মুখে পড়ত তখন গাড়িটা লাইন চ্যুত হয়ে এক বিরাট দুর্ঘটনা ঘটত। হাজার হাজার মানুষের জীবন সংশয় হয়ে যেত।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন রেলের পদস্থ অফিসাররা। জরুরি ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেল লাইন সারানোর কাজ। একজন বড়ো অফিসার সব দেখে শুনে জিজ্ঞেস করলেন গাড়িটা থামল কী করে ? ড্রাইভার বলল, দুটো বাচ্চা ছেলে লাল কাপড় দেখিয়ে গাড়িটা থামিয়েছে।

কোন্ দুটো ছেলে, খোঁজ পড়ল তাদের। সবাই প্রশংসা করতে লাগল তাদের তাৎক্ষণিক বুদ্ধির। কিন্তু যাদের জন্য আজ রেল একটা বড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল, বেঁচে গেল কতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ, যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ এত মানুষ, সেই পাপ্পু ও বিশ্বর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। তারা তখন মেতে উঠেছে অন্য খেলায়।


কাহিনি ও কমিকস
বারিদ বরণ চৌধুরী
যমজ ভাই-এর
চেনা শত্রু
পিন্টু স্যারের জন্মদিনে নিজেদের তৈরি জিনিস উপহার দিলে কেমন হয় ?
দারুণ হবে রে সেন্টু ।
স্যারের মূর্তি বানাবো। সেটাই হবে সবচেয়ে সেরা।
তোদের কর্ম নয়।
পিন্টু কাজ প্রায় শেষ। মূর্তিটা না শুকোনো পর্যন্ত সাবধানে রাখতে হবে।
সেন্টু ঠিক বলেছিস।
কেমন হয়েছে রে বিট্টু ?
এটা স্যারের মূর্তি হয়েছে ? মনে হচ্ছে যেন স্যারের শ্বশুরের আমাশা হয়েছে।
আমি যাকে দিয়ে আঁকিয়েছি তার থেকেও ভালো কাউকে দিয়ে মূর্তিটা বানিয়েছে নিশ্চয়ই। গুলতি দিয়ে...
সর্বনাশ ! নাক ভাঙা। কি হবে সেন্টু ?
আমি নিশ্চিত এটা বিট্টুর কাজ।


বিট্টু বাড়ির বাইরে যাচ্ছে।
ছবিটা স্যারের পছন্দ হবে কিনা একবার দেখতে বলে আসি।
তোরা এসেছিস ? স্যার এক্ষুনি এসে যাবে।
বিট্টু তোর আঁকা স্যারের প্রতিকৃতি আজ উদ্বোধন হবে বুঝি ?
আমাকে ডেকেছিস কেন রে বিট্টু ?
স্যার আপনার একটা প্রতিকৃতি এঁকেছি। দেখুন তো পছন্দ হয় কিনা।
কি, পছন্দ হয়েছে স্যার ?
হিক্ক !
আধঘন্টা ধরে ছুটে চলেছি। স্যার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেলেন কেন ?
ধরতে পারলেই সব বুঝিয়ে দেব।
স্যার কেন খাপ্পা হয়ে গেলেন এখন বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্যারের সিং গজালো কি করে সেটা আমরা জানি না।
তোমরা কি জানো ?

রামায়ণ কথা



অযোধ্যাকাণ্ড

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শৃঙ্গবেরপুর ত্যাগ

ভোরে উঠে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, ভাই লক্ষ্মণ, সূর্যোদয় হয়ে গেছে। চলো এখনই আমরা গঙ্গা পেরিয়ে যাই।

গুহ তখনই মাঝি সমেত সুন্দর একখানা নৌকো আনিয়ে দিলেন। রথে আসা যাবতীয় জিনিসপত্র লোক নিয়ে একে একে নৌকোয় তুলে দিলেন। রাম তখন বর্ম তূণীর খড়্গ ধনু ধারণ করে লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে পাড় ধরে নামতে শুরু করেছেন, সুমন্ত্র এসে দাঁড়ালেন সামনে। জলে ভরা দু চোখ, রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, রাজকুমার, রথ ছেড়ে তুমি নদী পার হয়ে দূরে চলে যাচ্ছ, এখন আমি কী করব, আদেশ দাও।

রাম ডান হাতে স্পর্শ করলেন তাঁকে, সুমন্ত্র, তোমার মতো বন্ধু কেউ নেই। তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও। রাজা দশরথ মা কৌশল্যা ভেঙে না পড়েন, তাঁদের শুশ্রূষা করো। বলো, চোদ্দ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, ফিরে গিয়ে তাঁদের যেন কুশলে দেখতে পাই। রাজাকে বোলো, ভরতকে মাতুলালয় থেকে আনিয়ে যেন শীঘ্র রাজপদে অভিষেক করেন। তুমি ফিরে গেছ দেখলে কৈকেয়ীর বিশ্বাস হবে সত্যিই রাম বনে গেছে, ভরতের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়েছে। না হলে রাজাকে তিনি মিথ্যাবাদী মনে করবেন। তুমি কষ্ট পেয়ো না। কৌশল্যাকে বলো এই রথ আর অশ্ব সহ তুমি তাঁর কাছে থাকবে, বনবাসের শেষে এই রথেই তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সুমন্ত্রকে এইভাবে বারবার প্রবোধ করতে লাগলেন রাম। তারপর গুহর দিকে ফিরে বললেন, বন্ধু, এখান থেকেই আমার বনবাসী তপস্বীর বেশ নেওয়া উচিত। তুমি বটের আঠা আনিয়ে দাও। চুলে মেখে জটা বাঁধি। তারপর নৌকোয় গিয়ে উঠব।

নৌকো ছেড়ে দিল। নদীর মাঝখানে আসতে সীতা হাত জোড় করে গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করলেন, তোমার কৃপায় চোদ্দ বছরের পিতৃসত্য পালন ক'রে নিরাপদে যেন ফিরে আসি মা, ফেরার পথে তোমার, তোমার পাড়ের সব তীর্থ ও দেবালয়ে পুজো দিয়ে যাব।

দেখতে দেখতে অপর পাড় এসে পড়ল। সুমন্ত্র একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি এপার অবধি এসে পৌঁছল না।

চিত্রকূটের পথে

এপার হল গঙ্গার দক্ষিণ তীর। পাড় বেয়ে উঠে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, এখন থেকে সজনে বিজনে সর্বত্র সীতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তুমি আগে আগে চলো, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পিছনে চলব সবার রক্ষক হয়ে। তিনজনে চলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা শস্যশালিনী বৎস দেশে এসে পৌঁছলেন। চলার পথে বরাহ আর তিন রকমের হরিণ

শিকার ক'রে তাদের মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঢুকলেন গিয়ে বনে।

সন্ধ্যাবন্দনার পর রাম বললেন, লক্ষ্মণ, জনপদের বাইরে, বনদেশে এই আমাদের প্রথম রাত্রি। দেখ, কৈকেয়ীর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের বৃদ্ধ পিতা, তিনি এখন কী করবেন ? কোশল রাজ্য ভোগ করবেন এখন মাতাপুত্রে, কৈকেয়ী আর ভরত। কৈকেয়ী অতি হীনমতি, বিদ্বেষবশে আমার মাকে তিনি বিষ দিতেও পারেন। দেখ লক্ষ্মণ, ক্রোধ হলে শরবর্ষণে আমি পৃথিবী শত্রুশূন্য করতে পারি। কেবল অধর্মের ভয়ে নিজেকে সংবরণ করেছি। আজ মনে হচ্ছে, পিতার প্রাণহরণ করতেই কৈকেয়ী এসেছিলেন আমাদের ঘরে। এখন তিনি আমার তোমার দুজনের জননীকেই অশেষ যন্ত্রণা দেবেন। ভাই, আমি বলছি, তুমি ফিরে যাও। সুমিত্রাকে রক্ষা করো। আমি আর সীতা দুজনেই দণ্ডকবনে যাত্রা করব।

লক্ষ্মণ বললেন, দাদা, আপনি চলে আসার পরে অযোধ্যায় অমাবস্যা নেমে এসেছে। আপনি এমনভাবে আর বলবেন না। আপনাকে ছেড়ে থাকা আমার সাধ্য নয়।

জনহীন রাত্রির অরণ্য। শুধু বনের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই। তারই মধ্যে অকুতোভয়ে বটগাছের নীচে পর্ণশয্যায় তাঁরা গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর তাঁরা যাত্রা করলেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের দিকে। না-দেখা অঞ্চল, দু পাশে ফুলন্ত গাছপালায় শোভা হয়ে আছে। যেতে যেতে দিন ফুরিয়ে অন্ধকার হয়ে এল। রাম বললেন, দেখ, প্রয়াগের দিকে ওইখানটাতে যেন ধোঁয়া উঠছে, তাই না ? নিশ্চয় কোনো মুনির আশ্রম। গঙ্গা যমুনা দুই নদীর সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় সঙ্গম এসে পড়ল। আরো কতক পথ হাঁটতে তাঁরা গিয়ে পড়লেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের পর শিষ্যগণ বেষ্টিত হয়ে মুনি বসে আছেন একাগ্রমনে। রাম গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে নিজের পরিচয় দিলেন। ভরদ্বাজ বললেন, তোমায় নির্বাসনের কথা লোকমুখে আমার কানেও এসেছে। গঙ্গাযমুনার এই সঙ্গমস্থান অতি পবিত্র, রমণীয়। এখানে তুমি সুখে বসবাস করো।

রাম বললেন, ভগবান, এখানে অনেক লোকের যাতায়াত, আমাদের কথা জানতে পারলে তারা আরোই সর্বক্ষণ দেখতে আসবে। এখানে থাকার আমার ইচ্ছা নেই। আপনি কোনো নির্জন স্থান বলে দিন, সীতা যেখানে সুখে থাকতে পারবেন।

ভরদ্বাজ বললেন, তাহলে যাও, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্বত। সে পর্বতের চূড়া দর্শণ করলে পুণ্য হয়। অনেক বানর আর ভালুকের বাস সেখানে। বহু ঋষি সেখানে শতবর্ষ তপস্যা ক'রে স্বর্গে গেছেন। আমার মনে হয় সেখানে ঘর বেঁধে থাকতে পারলে তোমরা সুখে থাকবে। নয়তো যদি চাও, আমার আশ্রমে আমার সঙ্গেই থেকে যাও।

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রিবাস ক'রে পরদিনই রাম চিত্রকূটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মুনি বললেন, বেশ, যদি চাও তো প্রথম যাও সঙ্গমতীর্থে। সেখান থেকে পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর ধরে চলো, কিছু দূরে গেলে এক তীর্থ। সেখানে ভেলা বেঁধে নদী পার হয়ে যাবে। পেরোবার পর দেখবে সবুজ পাতায় ছাওয়া খুব উঁচু এক বটগাছ, তার নাম শ্যাম, গাছগুল্মে ভর্তি তার চারপাশ। সীতা যেন তাকে প্রণাম করেন। সেখান থেকে এক ক্রোশ পথ গিয়ে নীলবর্ণ এক বন। এই পথই চিত্রকূটে যাবার সবচেয়ে সুগম পথ, আমি বহুবার গেছি এই পথে।

মুনিকে প্রণাম ক'রে তখনই বেরিয়ে পড়লেন তিনজনে। প্রথম সঙ্গমতীর্থ, সেখান থেকে যমুনাতীর ধরে পশ্চিমে চ'লে সেই তীর্থস্থান। সেখানে শুকনো কাঠ জোগাড় করে শক্ত লতায় বেঁধে ভেলা তৈরি হল। তাঁদের ছাগচর্মের পেটি উঠিয়ে নিজেরা ভেলায় উঠে নদী পার হওয়া গেল। পাড়ে উঠে বহু গাছগুল্মবেষ্টিত বিশাল সেই শ্যাম বটবৃক্ষ। সীতা সে বটবৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন। সেখান থেকে ফের ক্রোশভর পথ চলার পথে নানা রকমের হরিণ শিকার করে তার মাংস নিয়ে যমুনাতীরের বনে তিনজন মিলে আনন্দের বনভোজন। তারপর নদীতীরের সমতলে তৃণশয্যায় সুখরাত্রিবাস।

সকালে উঠে যমুনার জল স্পর্শ করে তিনজনে চিত্রকূটের পথে যাত্রা করলেন। শীত সবে চলে গেছে। পলাশ ফুটেছে বনে বনে। ফলে ফলে নুয়ে আছে বেলগাছ ভল্লাতক গাছ। ডাহুক আর ময়ূর ডাকছে চারিদিকে। দেখতে দেখতে চিত্রকূট পর্বত দৃশ্যমান হয়ে উঠল। রাম বললেন, পর্বতের নীচের ওই সমতল কাননে আমরা সুখে থাকব। এখানে ফলমূল অপর্যাপ্ত। ঋষিরাও থাকেন কাছাকাছি। ওই দেখ বাল্মীকির আশ্রম দেখা যাচ্ছে। চলো প্রণাম ক'রে যাই। আশ্রমে গিয়ে ঢুকলেন তাঁরা অচিরে। মহর্ষি বাল্মীকিও মহা আনন্দে তাঁদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করলেন। আশ্রম থেকে বেরিয়ে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, এখানে আমাদের অনেকদিন থাকতে হবে। ভালো কাঠ সংগ্রহ করো। উপযুক্ত পর্ণশালা নির্মাণ করে নিতে হবে। কুটির প্রস্তুত হলে গৃহবাস করার বাস্তুশান্তি ক'রে নেয়াও প্রয়োজন।

অনেক ধৈর্য ও শ্রমে গৃহ প্রস্তুত হল। লক্ষ্মণ কৃষ্ণমৃগ বধ করে এনে তার মাংস রক্তশূন্য অগ্নিপক্ব করে দিলেন, রাম যথাবিধি হোম, দেবার্চনা ও বাস্তুশান্তি করলেন। তারপর গৃহপ্রবেশ হল। পিছনে ছবির মতো চিত্রকূট পর্বত, পাশে মৃগপক্ষীশোভিত মাল্যবতী নদী। চারিধারের বনে ফুল ফল পাখি আর মৃগের প্রাচুর্য। বায়ুপ্রবাহ থেকে সুরক্ষিত তাঁদের পর্ণকুটির। নির্বাসনের দুঃখ ভুলে আনন্দে তাঁদের দিন কাটতে লাগল।

জীবনে সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে

গড়েছিলেন নিজেকে



কত হাসি-কান্না দুরন্তপনা খুনসুটি হুটোপুটি দুষ্টুমিতে ভরা আমাদের ছেলেবেলা। জীবনের এই সেরা সময়টি পেরিয়ে এসে যাঁরা অনেক বড়ো হয়ে যান, তাঁদের ছেলেবেলার কথা কার না জানতে ইচ্ছে করে ! সেই বড়ো মানুষদেঁর সেরা সময়ের গল্পকথাই দলিল করে তুলছেন 'চিরকালের ছেলেবেলা'র প্রতি সংখ্যায় পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কাশী থেকে সংস্কৃত পড়ে 'শাস্ত্রী' উপাধি নিয়ে ফিরেও পিতা মহানন্দ টোল খোলেন নি। জমিজমা-বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ভাবেন নি কখনো। কথকতা করেই ছিল তাঁর আনন্দ। নিজে পালা লিখতেন, গান বাঁধতেন। ডাক আসত। কত দূর-দূরান্ত থেকে। সে ডাকে সাড়া দিয়ে যেতে হত পাটনায়, মুঙ্গেরে, এমন কি আগ্রাতেও।

কথকতা করে, পালাগান শুনিয়ে আর ক'পয়সাই বা আয়। ফলে চরম দারিদ্রে স্ত্রী-পুত্রের দিন কাটে গ্রামের বাড়িতে। বাবার গুণপনায়, কথকতায় মুগ্ধ তাঁর শিশুপুত্র। এগ্রামে সেগ্রামে বাবার সঙ্গে কতবার গিয়েছে। চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে শুনেছে কথকতা। স্বপ্ন দেখছে কথক ঠাকুর হওয়ার। আর কিছু নয়, গ্রামে গ্রামে কথকতা করে বেড়াবে। গ্রামের অদূরে ইচ্ছামতী নদী। বহে চলেছে কলকলিয়ে। ঝোপঝাড় ছড়িয়ে রয়েছে নদীর ধারে। ঝোপঝাড়কে শ্রোতা বানিয়ে ছেলে রপ্ত করত কথকতা।

ততদিনে ভরতি হয়েছে গ্রামের পাঠশালায়। গ্রামের স্কুলের পাট চুকিয়ে সেই ছেলে ভরতি হয়েছিল বনগাঁ হাইস্কুলে। বছর চোদ্দ তখন বয়েস। বারাকপুর থেকে বনগাঁর দূরত্ব কম নয়। মাইল ছয়েক তো বটেই, প্রতিদিন এতখানি পথ পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করা রীতিমতো কষ্টের। তাই থাকার ব্যবস্থা হয় হস্টেলে। টানাটানির সংসারে বনগাঁয় থাকা, বইপত্র কেনা, স্কুলের খরচ সামলানো ক্রমেই দুষ্কর হয়ে ওঠে। বছর তিনেক এভাবে চললেও বাবার মৃত্যুর পর তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস স্কুলের হেডমাস্টারমশায় এক সরকারি ডাক্তারের বাড়িতে টিউটরের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়নি লেখাপড়া।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে, প্রথম বিভাগে পাশের পর স্বপ্ন-শহর কলকাতায়। গোলকধাঁধার মতো সে-শহর। শহরজীবনে নিজের অসহায়তা, দারিদ্র আরও বেশি করে প্রকট হয়। পরীক্ষার ফি জোটাতে না পেরে ইন্টামিডিয়েটে বসাই অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। সেই সংকটের দিনে এক বিজ্ঞানীর কথা কানে আসে। সায়েন্স কলেজেই থাকেন তিনি। বিয়ে সাদি করেন নি। সায়েন্স কলেজই তাঁর ঘরবাড়ি। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি বড়ো

ভরসা। গিয়ে দাঁড়ালেই মুশকিল আসান। মেলে পরীক্ষার ফি-য়ের টাকা, মেটে অন্যান্য প্রয়োজন। একদিন সব জড়তা ধুয়ে মুছে উপস্থিত হয় সেই বিজ্ঞানীর কাছে।

এই বিজ্ঞানীই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্যদেব সেদিন ফি-য়ের টাকা দিয়ে প্রয়োজনটুকুই মেটান নি, করেছিলেন উজ্জীবিতও। এই তরুণটি দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনে সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে গড়েছিলেন নিজেকে। পৌঁছেছিলেন শিখরে। আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি।

বিতূতিভূষণ বি-এ পড়তেন রিপন কলেজে। রিপন কলেজ থেকে পাশের পর এম-এ। দর্শন নিয়ে এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভরতি হলেন ল-তেও। প্রবল দারিদ্র। একটা চাকরির বড়ো প্রয়োজন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর চাকরি মেলে শহর থেকে অনেক দূরে, হুগলির এক প্রত্যন্ত গ্রাম।

না, জাঙিপাড়ায় ভাল্লাগেনি বিভূতিভূষণের, শুরু হয় অন্যত্র চাকরির চেষ্টা মিলেও যায় আরেকটি স্কুলে মাস্টারির চাকরি। চাকরি মেলে সোনারপুর-হরিনাভিতে। এই স্কুলে চাকরি করার সময়ই প্রায় মানসম্মান বাঁচাতেই বিভূতিভূষণকে হাতে কলম তুলে নিতে হয়।

হঠাৎ একদিন বিভূতিভূষণের নজরে পড়ে তাঁকে নিয়ে পোস্টার পড়েছে স্কুলের দেয়ালে। পোস্টারে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা, 'বিভূতিভূষণের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'চঞ্চলা' প্রকাশিত হইল।'

'পোস্টার দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন বিভূতিভূষণ। গোয়েন্দার ঢঙে গোপনে খোঁজ নিলেন, কে লিখতে পারে এই পোস্টার ! জানাও গেল, একাজ পাঁচুগোপালের। এরপর সত্যিই তিনি লিখে ফেলেন একটি গল্প। সে গল্পের নাম 'উপেক্ষিতা'। গল্পটি লেখার পর ফেলে রাখেননি। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'প্রবাসী'তে। কয়েক সংখ্যা পরেই ছাপা হয় সে-গল্প। পাঁচুগোপাল বাংলার শিক্ষক বিভূতিভূষণকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে নিজেই বোধহয় বোকা বনে গিয়েছিল।

'উপেক্ষিতা' প্রকাশের পর বিভূতিভূষণ সাহিত্যের অঙ্গনে আর উপেক্ষিত থাকেন নি। জীবনকে তিনি নিকট থেকে দেখেছেন। গ্রামের জীবনযাপন, মানুষজন সম্পর্কে ছিল তাঁর অফুরান অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আলোকিত 'পথের পাঁচালী'। চিরায়ত 'পথের পাঁচালি'র পাশাপাশি রয়েছে অরণ্য-গাছপালার প্রতি ভালোবাসা জাগানো 'আরণ্যক'। 'ইচ্ছামতী' বা অশনি সংকেত'-এর মতো স্মরণীয় উপন্যাসেরও তিনি স্রষ্টা। লিখেছেন অজস্র মনে রাখার মতো গল্প, কিছু দিনলিপি। ছোটোদের জন্যও লিখেছিলেন অনেক। 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসটির তো কোনো তুলনাই হয় না। ছোটোদের সেরা উপন্যাসের তালিকা করতে বসলে বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'কে রাখতে হবে একেবারে প্রথমদিকে।

চেনা-চেনা লাগছে ? বেশ, করো তবে SMS

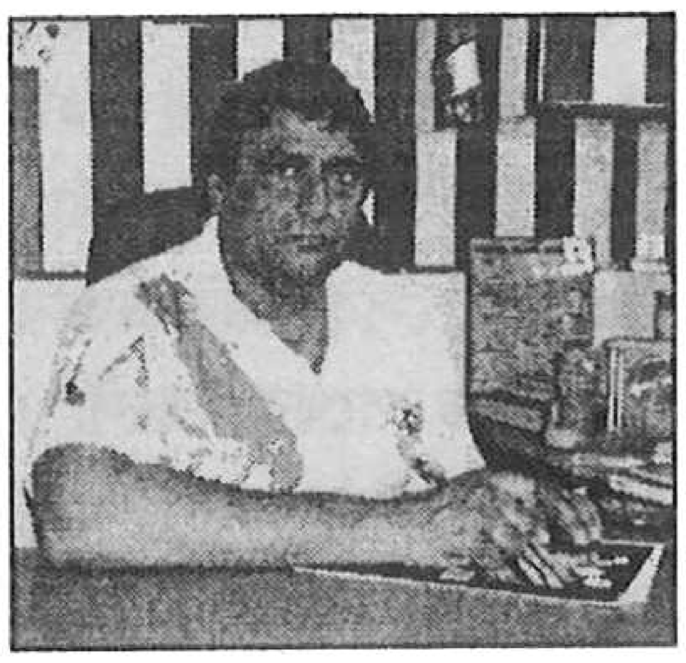
নভেম্বর সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

অরূপ মণ্ডল (সতীন্দ্রপল্লী, গড়িয়া), **পাপিয়া কামিল্যা** (তমলুক, পশ্চিম মেদিনীপুর), **সৃজিৎ রায়** (কুঁদঘাট, কলকাতা), **অনুপম ও অভিযান গিরি ও ছোটো কাকু** (কালীবাড়ি, বাগনান), **সুমনা দে** (তলজুলি, পূর্ব মেদিনীপুর) **বৌধায়ন ভট্টাচার্য** (নর্মদা হাই স্কুল, কলকাতা), **প্রসুন মুখার্জী** (পাটুলি, কলকাতা), **অঞ্জনা মজুমদার** (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ), **গৌরব কর্মকার** (পাঁশলা, হাওড়া), **সবুজ ও তুলি কয়াল** (মেমারী, বর্ধমান), **অজয় দাস** (বেহালা, কলকাতা), **বিপিন পাল** (জগন্নাথপুর, হাওড়া), **রিনি মাইতি** (তিওরখালি, পূর্ব মেদিনীপুর), **ঋতম মুখার্জী** (ঠাকুরনগর, উঃ২৪ পরগণা), **ঝুমুর দাস** (কাটোয়া, বর্ধমান)

ডিসেম্বর সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

আনারুল মোল্লা (দাশনগর, হাওড়া), **পার্থ রাহা** (বড়িশা পূর্ব পাড়া, ঠাকুরপুকুর), **সৈকত রাউত** (গোরাবাজার, বহরমপুর), **নিলাঞ্জণা ও উপাসনা রায়** (আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি), **ঝুমা মাজি** (নোনানন্দনপুকুর, ২৪ পরগণা), **সৌম্যদীপ দত্ত, পায়েল ভৌমিক** (ব্যানার্জী পাড়া রোড, ঢাকুরিয়া), **অজয় দাস** (বেহালা, কলকাতা), **প্রাণেশ দাশ** (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া), **শুভজিৎ ও অভ্রজিৎ জানা** (চাতরার মোড়, বাঁকুড়া), **পম্পি মিত্র** (মহিষাদল, পশ্চিম মেদিনীপুর), **অনুপম ও অভিযান গিরি ও ছোটো কাকু** (কালীবাড়ি, বাগনান), **রহিত মান্না** (সিঁথির মোড়, কলকাতা), **সবুজ ও তুলি কয়াল** (মেমারী, বর্ধমান), **অনন্ত দাস** (পূর্ব শান্তিনগর, জলপাইগুড়ি)

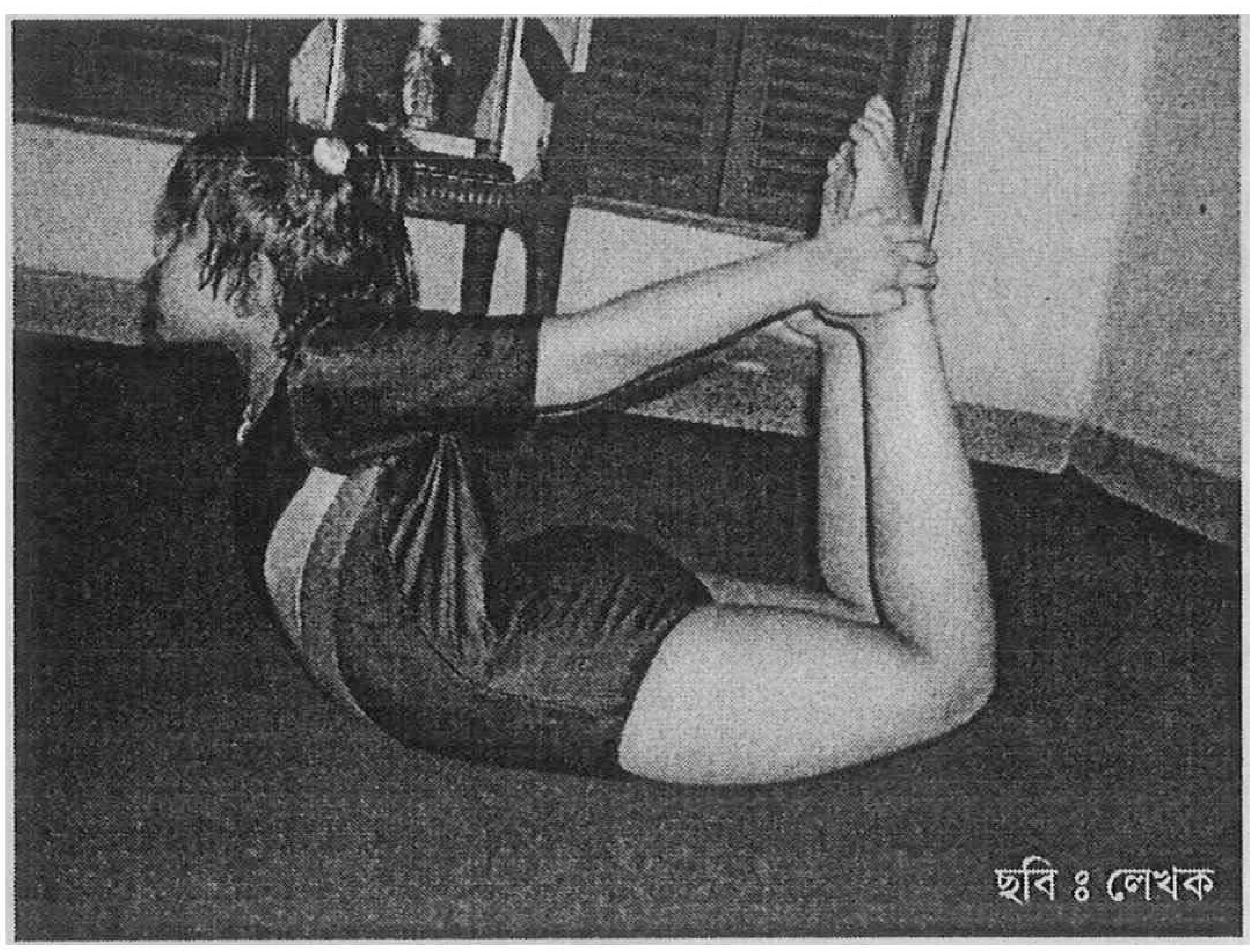
ধনুরাসন লম্বা হতে সাহায্য করে



জন্মের পর থেকেই হাত-পা ছুঁড়ে আমরা খেলতে থাকি। শরীর চর্চার শুরু তো সেখান থেকেই। কিন্তু এক সময় অনেকেই ভুলে যাই শরীটাই আমাদের প্রধান সম্পদ। ছোটো বন্ধুদের শরীরচর্চায় মনোযোগী করে তোলার জন্য 'চিরকালের ছেলেবেলা'র পাতায় লিখে চলেছেন প্রখ্যাত যোগ গবেষক ও যোগ প্রশিক্ষক

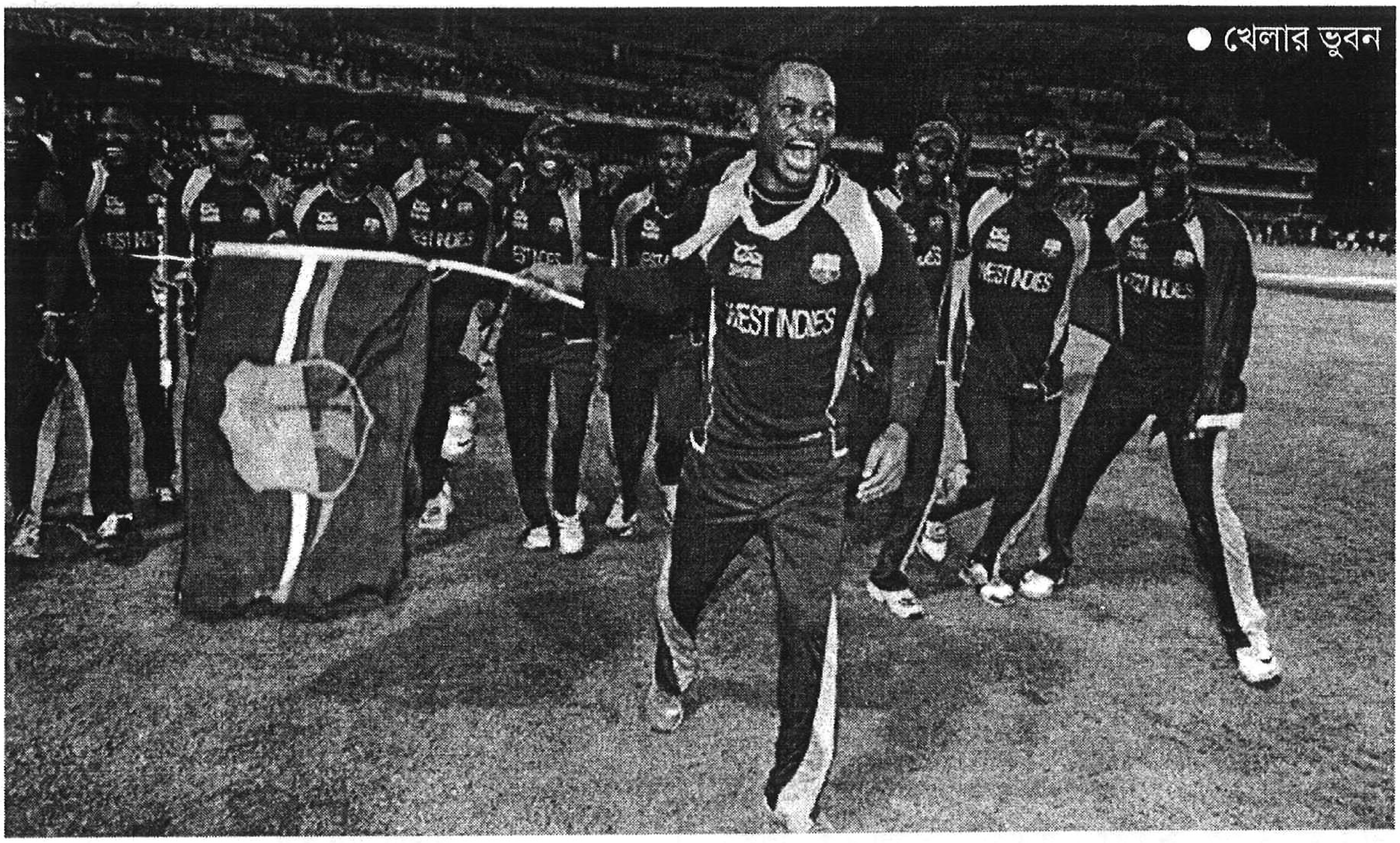
ডঃ তুষার শীল

মাঝে মাঝে মনে হয় থাক আজকের আর ব্যায়াম আসন করব না। তোমাদের তো হয়ই এমনভাব। আমাদেরও হয়। তোমাদের মতো বয়সে মাঝে মাঝে মনে হত আজ আর পড়বো না বা স্কুল যাব না। মা বা বাড়ির লোকেরা জোর করে স্কুলে পাঠাতেন। ফিরে এসে মনে হত না গেলে কত কিছু থেকেই বাদ পড়তাম আজ। ভাগ্যিস বাড়ির লোকেরা জোর করে স্কুল পাঠালেন তাই কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত হলাম না। শিখতেও পারলাম অনেক বেশি। আমাদের সমস্ত জীবনটাই একটা যোগ। যোগের শাস্ত্রে বা বইয়ে যোগ চর্চার নানান বিঘ্ন বা বাধার কথা বলা হয়েছে। যেমন - অতিরিক্ত আহার, সবসময় অধিক পরিশ্রম জনিত কাজ, বেশি কথা বলা, চপলতা ইত্যাদি। আবার উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য, জ্ঞান অর্জন, শাস্ত্র, শিক্ষক বা গুরুর কথা শোনা আর সবসময় হৈহুল্লোড়ে মেতে না থাকা। এগুলি আবার কাজে, লেখাপড়ায় সফল হওয়ার সহায়। এই সব কথাগুলো জানার ছিল। ছোটো বয়স থেকে অভ্যাস করতে পারলে দেখবে সব কাজেই সফল হচ্ছো। গোটা জীবনটাই একটা যোগ হয়ে যাবে।



ছবি ঃ লেখক

এখন আজকের আসন। ধনুরাসন। হলাসনের পর ধনুরাসন করলে লম্বা হতে সাহায্য করে, দূর হয় কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ প্রভৃতি রোগ। উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে দু-পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে দু-হাত দিয়ে দু-পায়ের পাতা মেয়েটির মতো ধরে নাও। এখন পা-দুটি ছড়াবার চেষ্টা করলেই নাভী থেকে শরীরের উপর অংশ এবং নিচের অংশ মাটি থেকে উঠে পড়বে। যেমনটি উঠেছে মেয়েটির। মাথাটা উল্টে দিও যতটা পারো। খেয়াল রাখবে হাত থেকে যেন পা না ছাড়ে। এই অবস্থানে থেকে লম্বা লম্বা দম নেওয়া-ছাড়া কর ১০/১৫ বার। এককক্ষেপ হল। এটি আসন পর্যায়ে শেখানো হল। ব্যায়ামের পর্যায়ও করতে পারো। একইভাবে দু-হাত দিয়ে দু-পা ধরে নিয়ে শ্বাস নিতে নিতে ধনুরাসন কর, পর মুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরটাকে ঢিলে করে দিয়ে থুতনি ও হাঁটু মাটিতে লাগিয়ে দাও। কিন্তু হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধরাই থাকবে। আবার শ্বাস নিতে নিতে ধনুরাসন অবস্থানে চলে এসো এবং ছাড়তে ছাড়তে ঢিলে করে দাও শরীর। এভাবে ১০/১৫বার প্রতি ক্ষেপে চেষ্টা কর। যেভাবেই করো না কেন ২/৩ ক্ষেপ করার চেষ্টা করবে। প্রতি ক্ষেপের পর উপুর হয়ে শুয়ে শবাসন করবে।



কুড়ি-বিশের ক্রিকেট বিশ্বজয় ক্যারিবিয়ানদের

তাপস বাগ

কিংবদন্তী ব্রায়ান লারা পারেন নি, রিচি বিচার্ডসনের মতো তারকা ব্যাটসম্যান পারেন নি। লক্ষ্যে পৌঁছলেন সেন্ট লুসিয়া দ্বীপের অলরাউন্ডার ক্রিকেটার জারেন স্যামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সোনালী অতীত আবার ফিরে এল গেইল, স্যামি, নারিনদের হাত ধরে। গত ৭ অক্টোবর কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ঘরের মাঠে ৩৬ রানে হারিয়ে টি ২০ বিশ্বকাপ ঘরে তুলল ক্যারিবিয়ানরা।

সত্তরের দশকে পরপর দু'বার একদিনের ম্যাচের বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্ব ক্রিকেটে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন ক্লাইভ লয়েড, ভিভিয়ান রিচার্ডস, অ্যান্ডি রবার্টস, ল্যান্স গিবস, রোহন কানহাই-এর মতো তারকারা। তারপর দীর্ঘ ৩৩ বছর প্রতীক্ষার পর আবার ক্যারিবিয়ানদের বিশ্বজয় কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে। ফিরে এল ক্যারিবিয়ান দাপটের যুগ।

ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন কিংবদন্তী ক্লাইভ লয়েড দলকে ই-মেল পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'জিততেই হবে'। ক্রিস গেইলের কথায়। 'এটাই আমাদের কাছে ছিল সবচেয়ে বড়ো মোটিভেশন।' বলাবাহুল্য ছোট্ট কথাটি বিশ্বকাপ জিততে দলকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে।

ফাইনালে ব্যাট করতে নেমে জনসন চার্লস - ০ ও ক্রিস গেইল ৩ রানে দ্রুত আউট হয়ে গেলে বেশ চাপে পড়ে যায় ক্যারিবিয়ান বাহিনী। একটা সময় দশ ওভারে দলের রান ছিল

মাত্র ৩২। এরপরই ঝলসে উঠলেন মার্লন স্যামুয়েলস। ৫৬ বলে করলেন ৭৮ রানের দুরন্ত ইনিংস। মারলেন ৩টে চার ও ৬টি বিশাল ছক্কা। ৬ ছক্কার মধ্যে ৫টি হাঁকালেন শ্রীলঙ্কার এক নম্বর বোলার লসিত মালিঙ্গার বলে। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ১৩৭ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রতিপক্ষকে অল্প রানে বেঁধে রাখতে পেরে স্বভাবতই উৎফুল্ল ছিল শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা। অবশ্য সে আনন্দ খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। দ্বিতীয় ওভারেই ছিটকে যায় অভিজ্ঞ তিলকরত্নে দিলশনের উইকেট। চাপে পড়ে পরপর উইকেট হারাতে থাকে শ্রীলঙ্কা। অবশেষে ১৮.৪ ওভারে ১০১ রানে শেষ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। কিছুটা লড়াই করেছিলেন দলনায়ক মাহেলা জয়বর্ধনে (৩৩)। বল হাতে ফের ম্যাজিক দেখালেন আই পি এল খ্যাত স্পিনার সুনীল নারিন। মাত্র ৯ রান খরচা করে ছিনিয়ে নিলেন ৩টি মূল্যবাণ উইকেট। ব্যাটে স্যামুয়েলস, বলে নারিন-দুই নায়কের দুরন্ত পারফরম্যান্সে ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের নতুন স্বর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হল।

দীর্ঘ তিন দশক সাফল্য থেকে বঞ্চিত ক্যাবিরিয়ান দ্বীপগুলির বাচ্চারা ব্যাট-বল ছেড়ে ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবলের দিকে ছুটতে শুরু করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বিশ্বজয় নতুন করে জোয়ার আনবে ক্যাবিরিয়ান ক্রিকেটে। ক্যারিবিয়ানদের জার্সির রং মেরুন। প্লেয়াররা বলেন, তাঁদের রক্তের রংও নাকি মেরুন। ভাবতে অবাক লাগে দেশের প্রতি কি অসীম-ভালোবাসা জারেন স্যামিদের।

যেভাবে ক্যারিবিয়ানদের বিশ্বজয়	
গ্রুপ লিগ	• অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৭ রানে হার। • আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ পরিত্যক্ত। রান রেটে এগিয়ে থাকায় সুপার এইটে ওঠার সুযোগ।
সুপার এইট	• ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ রানে জয়। • শ্রীলঙ্কার কাছে ৯ উইকেটে হার। • নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে জয়।
সেমি ফাইনাল	• অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭৪ রানে জয়।
ফাইনাল	• শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩৬ রানে জয়।

সাফল্যের আঙিনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

- ১৯৭৫ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন
- ১৯৭৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন
- ২০০৪ মিনি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন
- ২০১২ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন

ধ-এ ধাঁধা
গোপাল দাস

১। চিড়িয়াখানায় প্রথম একটা পরিযায়ী পাখি এল। এই সময় আরো একঝাঁক পাখি এল। প্রথম পাখিটা জিজ্ঞেস করল, কিরে ক'জন এলি ? উত্তরে একজন বলল, আমরা যতজন এসেছি, তার দ্বিগুন আসবে একটু বাদে আর তোমাকে নিয়ে আমরা মোট ১০০ জন হব।

দ্বিতীয়বার কতজন এসেছিল এবং তৃতীয়বার কতজন আসবে ?

২। আট পা ষোলো হাঁটু
মাছ ধরে খায় টুটু
ডাঙায় পাতিয়া জাল
মৎস ধরে চিরকাল।

৩। বাপ বেটা এরা, বাপ বেটা ওরা
আমবাগানে যায়
তিনটে আম পেয়েই তারা
না কেটেই খায়।

৪। নিজে কিন্তু ঘুমোয়
আর সকলকে ডাকে
জেগে উঠে রেগে গিয়ে
সবাই তাকে ডাকে।

আগস্ট সংখ্যার উত্তর :
১) সন্দেশ ২) বিদ্যাসাগর ৩) পাঁচিল ৪) পান

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম : **ঝুমা মাজি** (নোনানন্দনপুকুর, ২৪ পরগণা), **নেহা সামন্ত** (গড়িয়া, কলকাতা), **পারমিতা মণ্ডল** (পঃ মেদিনীপুর), **সুমেধা হাজরা** (বাইনান, হাওড়া), **মৌসুমী বর্ধন** (মেমারী, বর্ধমান), **রিয়া ও প্রিয়া অধিকারী** (বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা) **সবুজ ও তুলি কয়াল** (মেমারী, বর্ধমান), **রহিত মান্না** (সিঁথির মোড়, কলকাতা), **সৈকত রাউত** (গোরাবাজার, বহরমপুর), **উপাসনা রায়** (আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি),

উত্তর দিতে ফোন বা SMS করো 90077 67551

এই বিভাগে সঠিক উত্তরসহ ধাঁ-ধাঁ পাঠান ছোটো বন্ধুরাও পাঠাতে পারো।



মা

শুভ্রদীপ কর

নবম শ্রেণি, ১৪ বছর
বাঙালপুর ইউনিয়ন চমৎকারী উচ্চবিদ্যালয়
(বাঙালপুর, বাগনান)

আজও উজ্জ্বলভাবে মনে আছে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সব থেকে বড়ো অঘটন। রাতের আকাশে আজও খুঁজি সেই মানুষটিকে। তবুও খুঁজে পাই না লক্ষ লক্ষ তারার আলোর মাঝে। কিছু জিনিস জীবনে একান্তই আপন যা উপলব্ধি সে কেবল নিজেই করতে পারে। অন্য কাউকে বোঝাতে পারে না। আজ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে 'Man is Murtal' এই প্রবাদ বাক্যটিকে। সব মানুষেরই জীবনে আসে বা আনবে দুঃখ ও সুখ। এটা যেন একটা ক্যুইজের মিক্সড ব্যাগ।

২০১২, উত্তীর্ণ হলাম নবম শ্রেণি, দশমের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি দিতে লাগলাম। কারণ 'মাধ্যমিক'। তারই মাঝে ঘটে গেল মায়ের অসুখ। ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয়, হয়তো নার্সিং-এ থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে। চিকিৎসা চলতে লাগল। অসুখ কমতে লাগল। মাঝে আমার জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষার Unit Test গুলো দিতে পারলাম না। পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটল বেশ খানিকটা। কেননা মায়ের জন্য ছুটে যেতাম প্রায় প্রতিদিনই বাবার সঙ্গে কলকাতায়। মাও দেখতে চাইতেন আমাকে। সেই হসপিটাল, সেই বেড, সেই আমার আদরের মা। গেলেই মায়ের প্রথম প্রশ্ন– 'বাবা খেয়ে এসেছিস ?' আরো অনেক প্রশ্ন ও মাথায় হাত বুলিয়ে বলত, পড়াশুনো ঠিক ঠাক করছিস তো বাবা। এমনি করেই কেটে গেল দু'মাস। ডাক্তারি ভাষায় মায়ের নাকি হয়েছিল, 'Multiple Tuberculosis' যা জীবের L2 থেকে Brain পর্যন্ত। সমস্ত চিকিৎসাই করা হচ্ছিল। কিন্তু ফল আশাপ্রদ হয়নি। এর মাঝখানে ভুলেই গেলাম আমার পরীক্ষা ও পড়াশুনো।

হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল– দেখলাম যে অতীতের স্মৃতি চারণা করছিলাম। সেই দিনও ঘুম ভেঙেছিল রাত তিনটে নাগাদ। তারিখটা ছিল ৬ই নভেম্বর। কারেন্ট ছিল না হসপিটালে। মা-র জন্য চিন্তা বাড়ল। ভাবলাম ভেন্টিলেশন মেশিন চলছে তো ! বাইরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছিল। আর ঘুম আসছিল না, উঠে বসলাম। আমার সঙ্গে ছিল বাবা, কাকা ও দাদা। ভাবলাম যে ভেন্টিলেশনে আছে মানে মা ঠিক হয়ে যাবে। সকালবেলা ক্ষণিকের জন্য বাড়ি ফিরলাম। তারপর.....

আজও উপলব্ধি করি মায়ের সেই আদর। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসা সেই মায়ের ডাক। আসতে আসতে বইয়ের পাতায় চাপা পড়ে সমস্ত স্মৃমিগুলো। নানা কোলাহলে হারিয়ে যায় মায়ের সেই ডাক। শুধু আসায় সান্ত্বনা নিই যে– 'ফিরে পাব'।

সৌতি বসাক চতুর্থ শ্রেণি, ৯ বছর
সাউথ পয়েন্ট স্কুল (কলকাতা)



বেথলেহেমের আস্তাবলে জন্মে ছিলেন শিশু
জন্ম মাসে তাঁকে স্মরণ– মানব প্রেমিক যিশু।

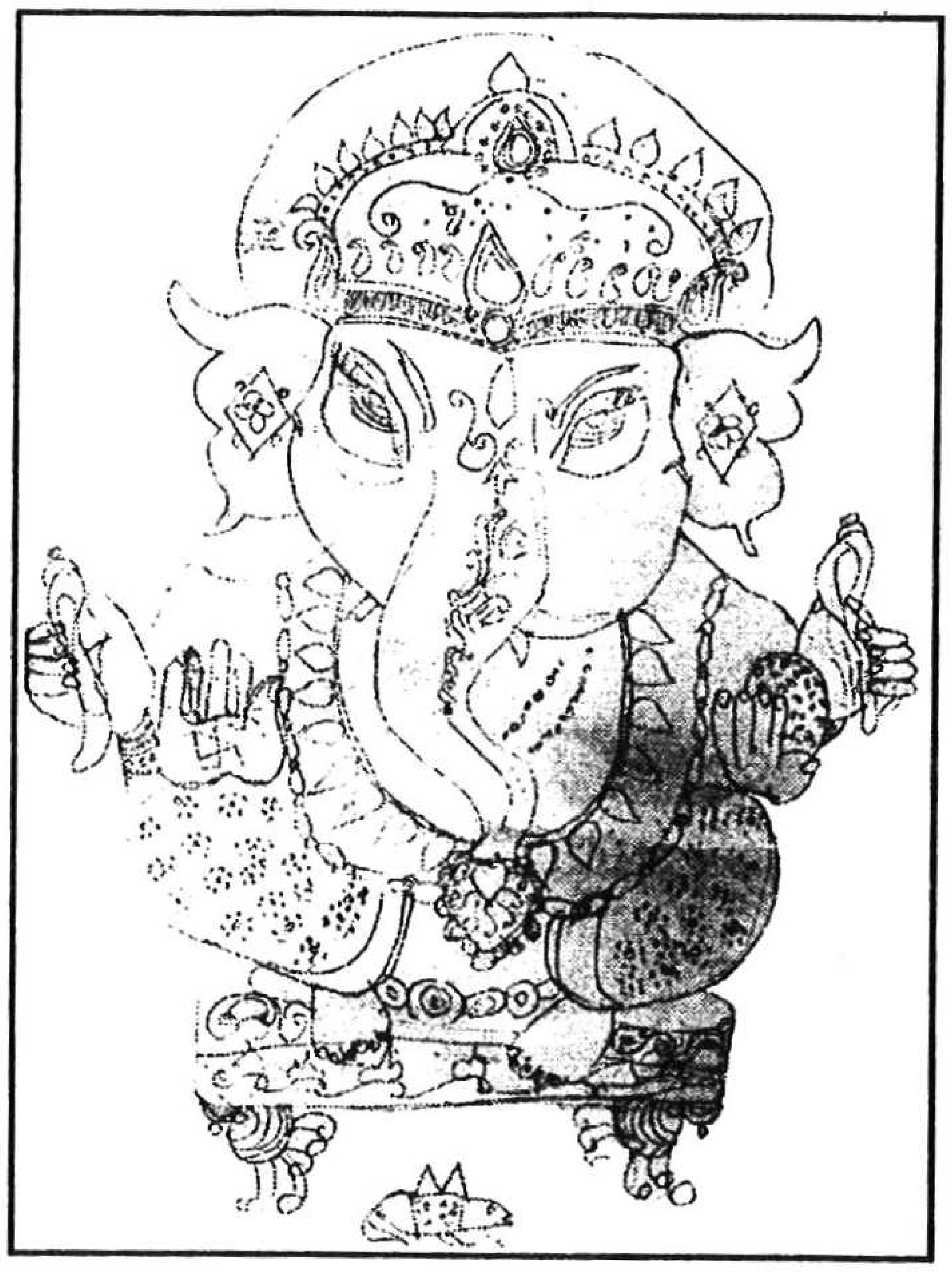
ভালো লাগে না

কৌশিক গোস্বামী

দশম শ্রেণি, ১৪ বছর
কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন (কাটোয়া, বর্ধমান)

ইস্কুলে যেতে ভালো লাগে না
ভালো লাগে না সন্ধে সকাল পড়া,
রবিঠাকুর, ইচ্ছে করে যেন
তোমার মতো লিখি কেবল ছড়া।
দাদা-দিদি কেউ বাসে না ভালো
ভুল করে 'ধ' বলি 'দ' কে
তখন ওরা বাবার গলা করে
ছোট্ট ভেবে আমায় যে খুব বকে।
রবিঠাকুর আমার এসব কথা
একটুও যে বোঝে না বড়োরা,
মেঘের দেশে পালিয়ে যেতাম
যদি পাঠিয়ে দিতে বীরপুরুষের ঘোড়া।

ইপ্সিতা মাল পঞ্চম শ্রেণি, ৯ বছর
কোতরা জুনিয়র হাইস্কুল (শ্যামপুর, হাওড়া)



গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা, হোন না গজানন
মজার ছবি যায় আঁকা তাঁর, তিনি মজা নন।

সুস্মী সাহা দ্বিতীয় শ্রেণি, ৭ বছর
লরেটো ডেজ স্কুল (ধর্মতলা, কলকাতা)



বৃষ্টিটা যে সৃষ্টিছাড়া, জানে বলেই ভুতো–
মাথায় ছাতা সামলে তবু আগলে চলে জুতো।

ছোট্ট পাখি

অভিজিৎ মণ্ডল

২য় বর্ষ (কলাবিভাগ)
(বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)

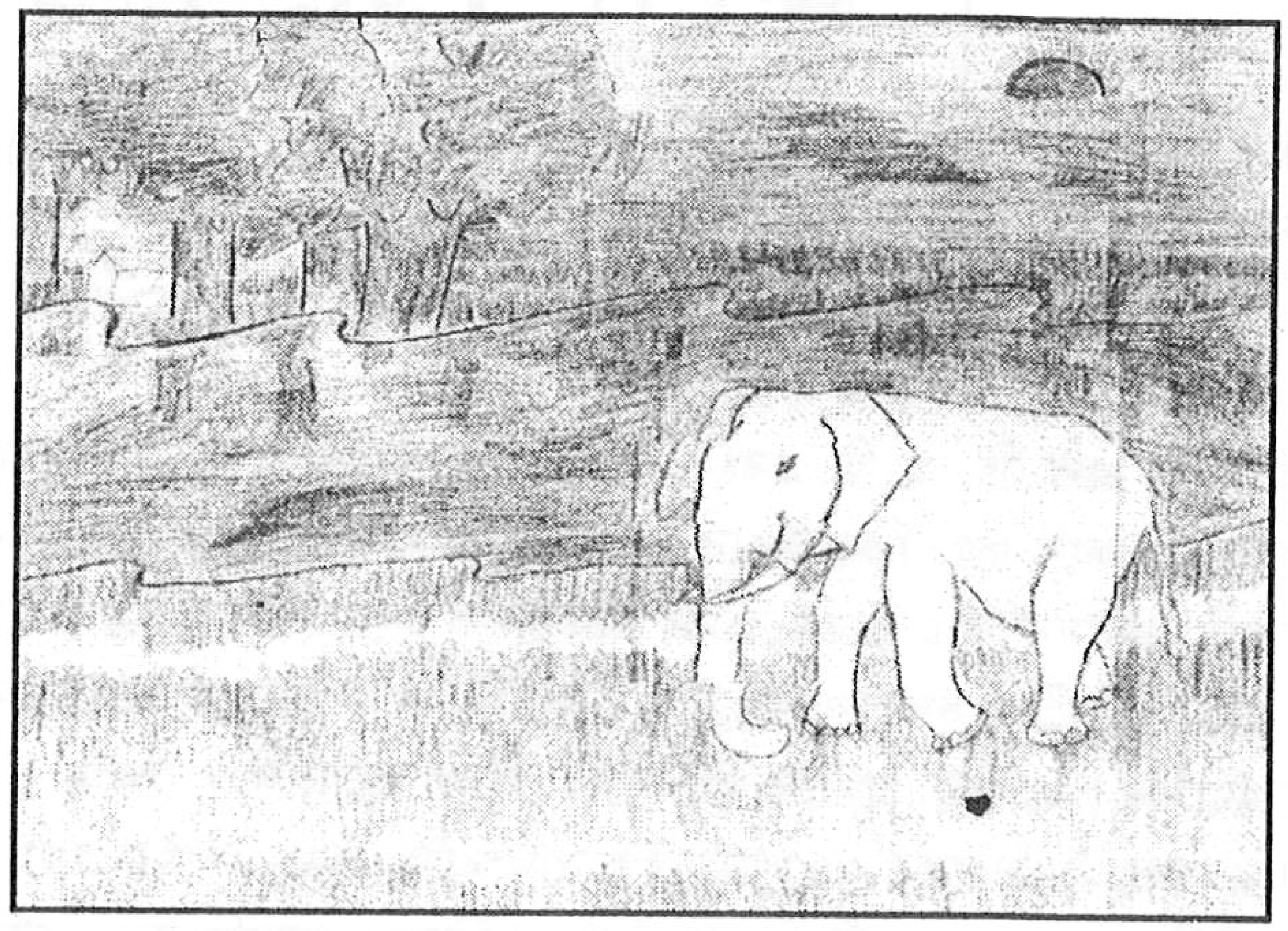
ছোট্ট পাখি ছোট্ট পাখি
আসছ কোথা থেকে ?
দূরে ওই গাঁ থেকে কি
রথের মেলা দেখে !
ছোট্ট পাখি ছোট্ট পাখি
হাতে তোমার কি ?
পাঁপড় ভাজা আছে বুঝি
আমায় দেবে কি ?
ছোট্ট পাখি ছোট্ট পাখি
সাঁঝ যে নেমে এল,
এখন তুমি বাসায় ফেরো
কালকে কথা বলো।

সৃষ্টি

সাহেব হালদার
দশম শ্রেণি, ১৬ বছর
গুরুদাসপুর মহেন্দ্র-ইন্দ্র বিদ্যামন্দির
(গুরুদাসপুর, দঃ ২৪ পরগনা)

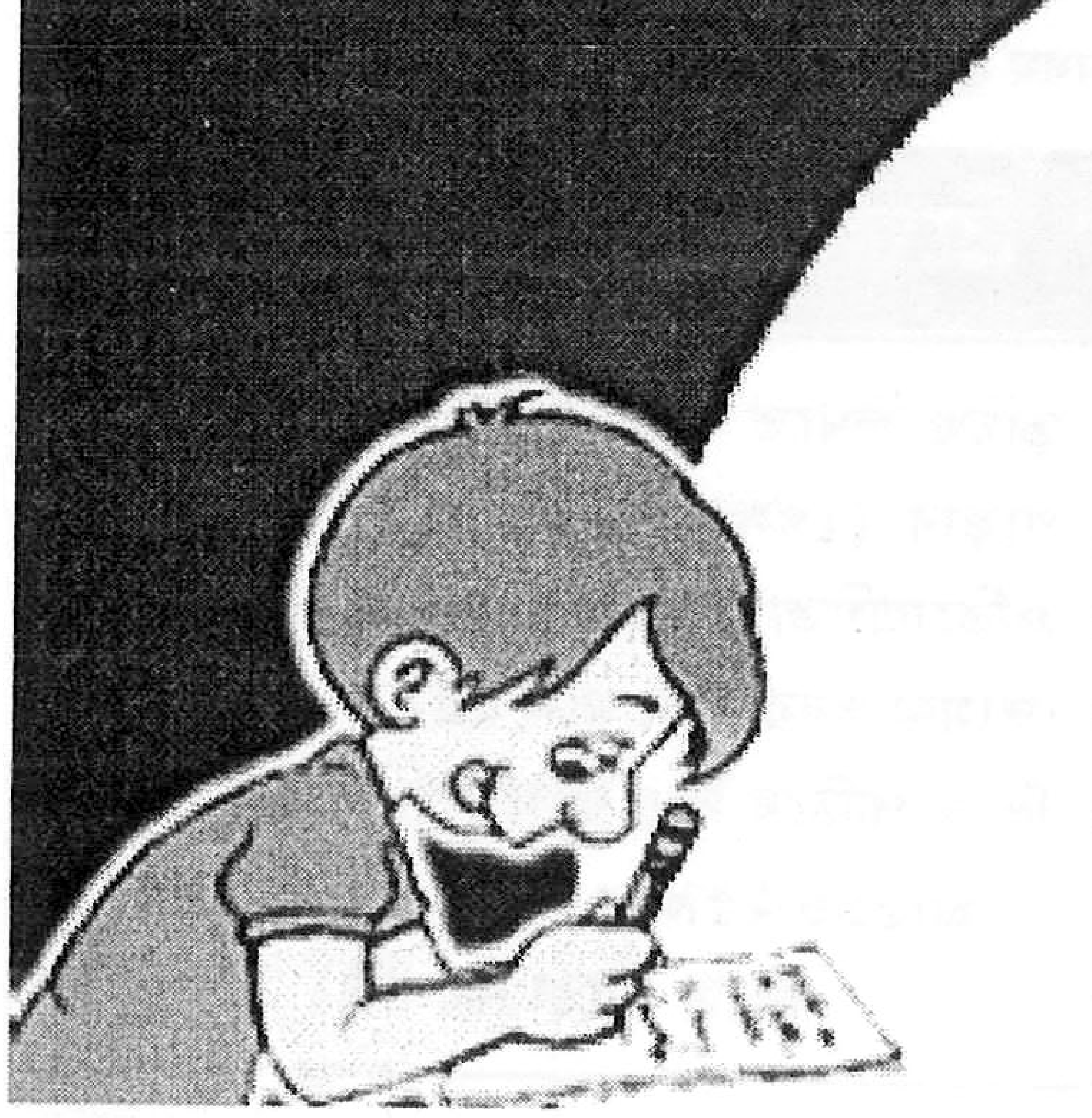
হে ভগবান বলতে পা.রো
কেমন তোমার সৃষ্টি !
নিমফলটি বড়োই তেতো
আপেল কেন মিষ্টি ?
কাঁঠাল কেমন গন্ধে ভরা
তেঁতুল কেন টক ?
কাক কেন এত কালো
সাদা কেন বক ?
সূর্যের যে এত আলো
চাঁদের কেন নেই ?
নক্ষত্রও আলোকিত
সূর্যের আলোতেই !
নীল আকাশে সাদা মেঘের
ভাসে কেন ভেলা ?
এসব ভেবেই যায় যে কেটে
আমার সারা বেলা।

শাশ্বতী মুখার্জী অষ্টম শ্রেণি,
মাকড়দহ গার্লস হাইস্কুল (ডোমজুড়, হাওড়া)



কেউ তো কিছু বলছি না হে, যাচ্ছো কোথায় হস্তী
খুঁজতে সে বন, নিবীড় গহন, মানুষ বিহীন– স্বস্তি !

তোমাদের ছবি আর আমাদের ছড়া কেমন লাগছে জানাও। পরিস্কার করে এঁকে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়। ছবি অবশ্যই সাধারণ জেরক্স কাগজের মাপের মধ্যে হতে হবে।



খেয়াল খুশি

সেদিন তোমার সঙ্গে হঠাৎ শীতবুড়ির দেখা। কী কথা হল তোমার তার সাথে ?

লিখে পাঠাও আমাদের ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে। সঙ্গে দিও তোমার নাম, ঠিকানা, বয়স, বিদ্যালয়ের নাম, কোন শ্রেণিতে পড়ো এবং (থাকলে) ফোন নম্বর।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

বন্ধুরা নানা অনুষ্ঠানের খবর দাও এই বিভাগে।

ক্ষুদে রিপোর্টারের দপ্তর

খাতা-কলম হাতে 'চিরকালের ছেলেবেলা'র বন্ধুরাই এখন রিপোর্টার

খবরের ছবি পাঠাতে পারো E-mail বা SMS করে

বনে-জঙ্গলে মা দুর্গা

সল্টলেকে এফ ডি, এ ভি এবং এ ই ইত্যাদি ব্লকের দুর্গাপুজো খুবই জাকজমক করে হয়। কিন্তু বিগত ১০ বছর সল্টলেকের এফ ডি ব্লকের 'ফাল্গুনি আবাসন'-এর পুজো তেমন জাকজমক করে হয়নি। কিন্তু এবার আবাসন কমিটির সদস্যারা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এবছর এখানে বহু স্টল খোলা হয়েছিল। বিগত ১০ বছরে 'ফাল্গুনি আবাসন'-এ পুজো হত সাদামাটা। কিন্তু এবছর এখানে বুদ্ধিজীবী সদস্যরা একটি বিশেষ থিম আবিস্কার করেছিলেন। সেই থিমটি হল– 'বনে-জঙ্গলে মা দুর্গা'। বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। এই অনুষ্ঠানের তালিম চলেছিল জোরকদমে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই। এখানে তিনটি নাটক হয়েছিল, সেগুলি হল– 'রাবনের লঙ্কাকাণ্ড', 'মহম্মদের পিতৃভক্তি' এবং 'দেবলোকে ইলেকশান'।

শুভাশীষ মজুমদার অষ্টম শ্রেণি,
মানিকতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (শিমলাপাড়া, কলকাতা)

বাঁদরের কীর্তি

প্রায় দু মাস আগে আমাদের কাশীপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে এক হনুমান সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে। দিনেরবেলা সে খাবারের সন্ধানে এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায় আর রাত হলেই সে থাকে গ্রামেরই একটা বড়ো বটগাছে। গ্রামের মানুষের কাছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছে সে। আমরা ছোটোরা ভালোবেসে তার নাম রেখেছি রকি। আবার কেউ কেউ চিম্পু, হুপি, বীর বা টাব্বু বলেও ডাকে। কিন্তু আদরের বাঁদর মানুষের ভালোবাসা বোঝেনি। তাই খিদে পেলেই স্বভাববশত সে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে লোকে হেঁসেলে। ঢুকে পড়ার তালিকায় বাদ নেই গ্রামের দোকানগুলোও। গত দু দিন আগে দুপুরবেলায় সহিদ মোল্লার বাড়ির লোকজনেরা বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিল আর তখনই রকি এসে তাতে ভাগ বসাতে চায়। মোল্লা সাহেবের বাড়ির ছোটোবৌ তাড়াতে গেলে বাঁদরের হাতে চড় খান তিনি। তাই এখন গ্রামের সকলের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে সে। শোনা যাচ্ছে এইসব কীর্তির জন্য রকিকে ধরে জঙ্গলে তার সঙ্গীদের কাছে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা ভাবছে প্রশাসন।

পল্টু পাত্র দ্বাদশ শ্রেণি, কাশীপুর, দঃ ২৪ পরগণা

মুর্শিদাবাদের কান্দিতে দুর্গা আর অসুরের লড়াই

চারিদিকে দুর্গাপুজো দুর্গাপুজো গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে মহালয়ার দিন পিতৃপক্ষের অবসান আর দেবীপক্ষের সূচনা। মহালয়ার দিন পূর্ণপ্রভাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'অন্তহীন'-এর পক্ষ থেকে মহিষাসুর মর্দিনী। অনেক ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করেছিল এই অনুষ্ঠানে। এই দিন সকালবেলা গোটা কান্দি পরিক্রমা হয়েছিল। 'বাজলো তোমার আলোর বেণু', 'জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহরণধারিনী', 'ওগো আমার আগমনী', 'তব অচিন্ত্য', 'দুর্গ দুর্গ দুর্গতিনাশিনী' প্রভৃতি গানে অন্তহীন মাতিয়ে তুলেছিল গোটা কান্দিবাসীকে। শুধু তাই নয় 'আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে' গানের সাথে অনেক কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরাও তাল মিলিয়েছে। এমনকি কান্দি বিষণতলায় হয়েছিল মহিষাসুরমর্দিনী। দুর্গা আর অসুরের লড়াই দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সিংহ, গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিক, সরস্বতী। কান্দি থানার সামনে ঢাকের সাথে ধুনুচি নাচ, সব মিলিয়ে অন্তহীন দেবী দুর্গার আগমনকে নতুনভাবে স্বাগত জানিয়েছে।

কৌশিক বড়াল
নবম শ্রেণি, কান্দিরাজ হাইস্কুল (কান্দি, মুর্শিদাবাদ)

রিপোর্ট দিতে পারো ফোনেও

তুমিও লিখতে পারো রিপোর্ট। স্কুলের কিংবা পাড়ার (*খেলা, আঁকা, নাচ-গান-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, পুজো*) নানান অনুষ্ঠান, যেটা তোমার খবর বলে মনে হয়।
লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে, অথবা ৯০৫১৬ ২৫৯৯৩ নম্বরে ফোন করেও দিতে পারো রিপোর্ট।



Printer & Publisher Dipali Roy & Owner Dipali Roy. Printed Ad. Welcome Printers, Pran Bagicha, Sodepur Brick Field Road, Kolkata - 82, Published Ad. Pran Bagicha, Sodepur Rabindra Nagar, Dactar Bagan, Kolkata - 700 082. Editors Name & Address : Dipali Roy, Pran Bagicha, Sodepur Rabindra Nagar, Dactar Bagan, Kolkata - 700 082. Mob. : 98316 30803 / 90077 67551, E-mail : chhelebela@gmail.com